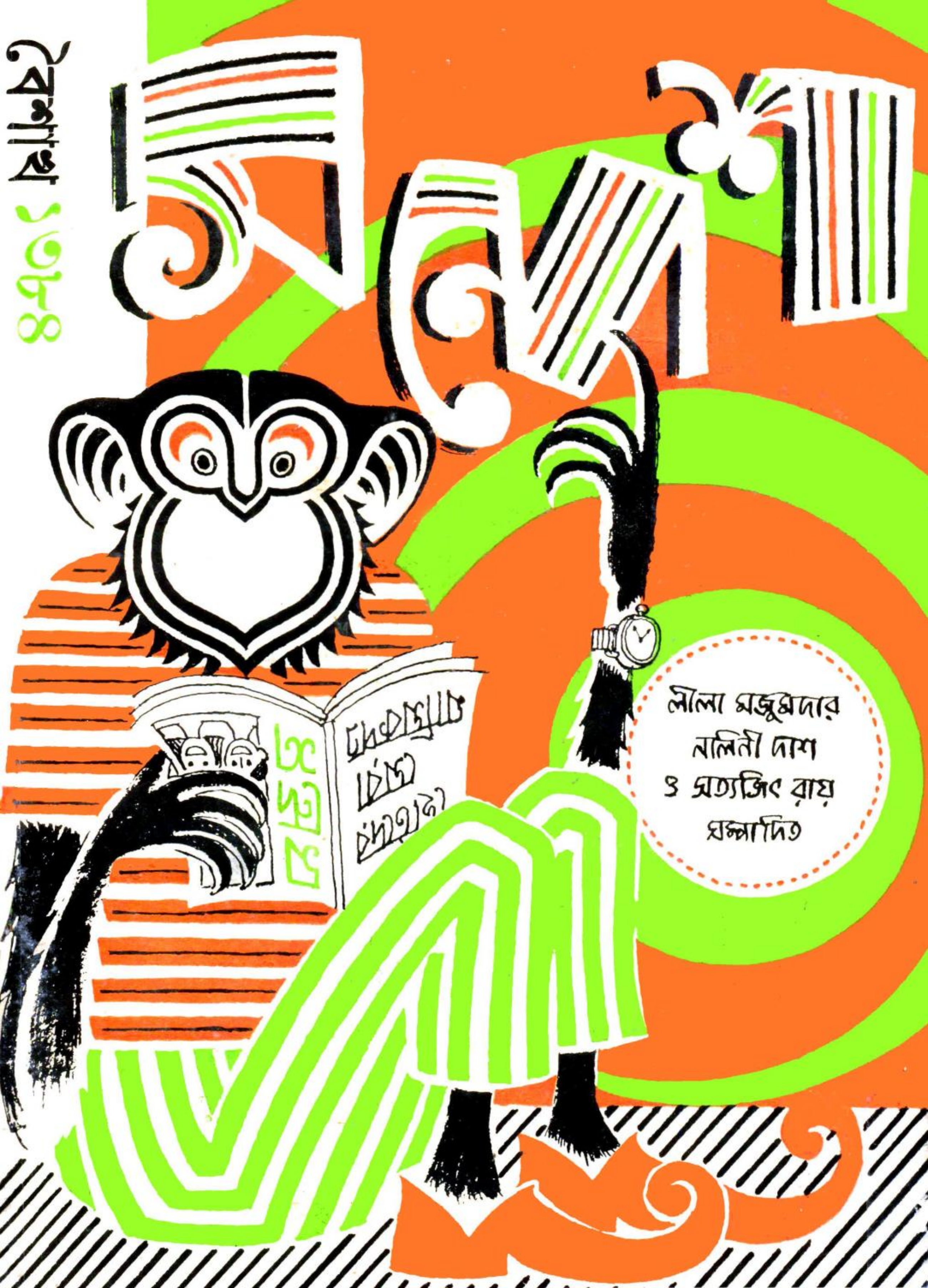
সন্দেশ
বৈশাখ ১৩৮৪
লীলা মজুমদার
নলিনী দাশ
ও সত্যজিৎ রায়
সম্পাদিত

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং
আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

বৈশাখ ১৩৮৪

সন্দেশ

লীলা মজুমদার - নলিনী দাশ
ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

পৃষ্ঠা

১। নথবাবাজী—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। গ্রীবা—গৌরী ধর্মপাল
১১। কি মুস্কিল!
১২। নফরচন্দ্রের বেড়াল—সুধীন্দ্র সরকার
১৫। বোনটি—নবনীতা দেবসেন
২১। অভিনব কুরুক্ষেত্র—ভবানীপ্রসাদ দে
২৪। হিসেবের কড়ি
২৫। আমার বাবার আরো খবর—মহাশ্বেতা দেবী
৩১। নববর্ষের চিঠি—সঃ সঃ
২২। ইনস্পেক্টর বিক্রম
৩৪। ভূতোর ডাইরি—লীলা মজুমদার
৩৮। দুই পাগল—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
৪১। খেলাধুলা—অজয় হোম
৪৪। প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর—জীবন সর্দার
৪৫। গল্পসল্প—লীলা মজুমদার
৪৭। গ্রাহক-সংগ্রহ প্রতিযোগিতা
৪৯। সম্পাদক সামন্ত মশাই—শৈবাল চক্রবর্তী
৫২। কার অধিকারে?—অজেয় রায়
৫৫। গণ্ডালু ও রাণী রূপমতীর রহস্য
—নলিনী দাশ
৬৬। শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ—সত্যজিৎ রায়
৭২। খুদে দুর্জয়—প্রণব মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ-১৩৮৪
এপ্রিল-১৯৭৭

সন্দেশ

নহবাবাগী

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যবাবুর নাম শুনেছ ? দরজীপাড়ার সূর্য সুর ?
আর্যকাকার আপন শালা—দুর্যোধনের খুড়শ্বশুর ?
নাম কোথা আর শুনবে বলো ? বাড়ির ভিতর সং সেজে
থাকেন তিনি। পয়সাও'লা দুর্জনেদের বংশে যে
এমন ক্ষ্যাপা কেমন করে জন্ম নিল—ব'লবে কে ?
অন্যে করে তেল মেখে স্নান—তিনি করেন ঘোল মেখে।
সব কিছু তাঁর 'অরিজিন্যাল',—নয়কো কিছুই ধার করা ;
দেশের লোকে যা করবে তার উল্টোটি চাই তাঁর করা।

গামলা ভরা তাই ত্রিফলার জল দিয়ে রোজ স্নান করেন ;
গুরু এলেই ভক্তিভরে জ্যান্ত গাধা দান করেন।
দিনে জ্বালেন বিশটা আলো—নিবিয়ে রাখেন রাত্তিরে ;
ভোজন সারেন অল্প কিছু মালপো এবং পাতক্ষীরে।

ভূর্জ পাতায় আরজি লিখে নেয় প্রয়োজন যার যত
কর্জ সবাই তাঁর কাছে—কেউ দেয় না ফেরত কার্যতঃ।
মর্জি হ'লেই দরজী ডেকে ছাঁটতে বলেন চুলদাড়ি ;
(দাড়িটি তাঁর তাই চুড়িদার তেড়িতে তাই ফুলকারী।)

ইস্ক্রু কিছু আলগা আছে মাথায় রটায় নিন্দুকে।
বই থাকে তাঁর রান্না ঘরে, কলসী হাঁড়ি সিন্দুকে।
গিন্নী থাকেন আস্তাবলে—উর্দি পরে জরদা খান ;
সর্দি হলেই ফর্দ লেখেন, ঘুম পেলে রোজ খড়দা যান।
পরদা ঢাকা অন্দরেতে রামছাগলের পাল ভরা ;
গর্দভও প্রায় অর্ধডজন—ক্ষীর দিয়ে খায় তালবড়া।

নাইকো মেয়ে—আছেন তবু ছ'জন বাবুর ঘরজামাই ;
ডজন দশেক জানলা আছে—বাড়িতে তাঁর দরজা নাই ;
মই দিয়ে তাই ওঠেন নামেন কর্তা ছাদে চারশ' বার ;
মাটির তলায় গর্তপথে হয় যাতায়াত আর সবার।
শীতকালেতে বরফ জলে ডুবে করেন প্রাণ ধারণ ;
গ্রীষ্মকালে আগুন জ্বেলে রোদ পোহায়ে ঠাণ্ডা র'ন।

মাছের পাছে আঘাত লাগে—বাঁধেন নাকো বঁড়শী তাই,
পুকুর পাড়ে থাকেন বসে ছিপ ফেলে দিনভোর বৃথাই।
রথের দিনে রঙিন শাড়ী কুঁচিয়ে প'রে নথ নাড়েন ;
পুরুষ মানুষ দেখলে পরে ঘোমটা টেনে পথ ছাড়েন।

যখন তখন নিত্য নূতন বুদ্ধি গজায় তাঁর পেটে ;
মাথায় রেখে কাঁথার বোঝা সাঁতার শেখেন কার্পেটে।
হাতে পরেন কাবলী জুতো—ফরমাসী মাল—সস্তা না।

অর্ডার দিয়ে তৈরী করা দুই পায়ে দুই দস্তানা।
কেউ যদি চায় পায়ের ধুলো—লাগান তাকে সাত চাপড় ;
কেউ যদি দেয় কানটি ম'লে—যোগান তাকে ভাত কাপড়

সুস্থ দেহে বৈদ্য ডেকে তরজা শোনান বারবারই ;
অসুখ হলে চিকিৎসকের প্রবেশ নিষেধ তাঁর বাড়ি।
বউ সেজে যান বাইরে কচিৎ, ঘোমটা-ফাঁকে নথ চোখে
পড়েই সবার, 'নথবাবাজী' নাম দিয়েছে বদ্‌লোকে।
কলসী ভরা বিচিত্র বেশ—পূর্ণ তাক আর ডেস্ক তায় ;
কেউ জানে না পাগলা সুরের খামখেয়ালীর শেষ কোথায় !

সূর্যসুরের গাধার জুড়ি চালাচ্ছিল ইসমাইল,
(চাবুক দিলে দাঁড়ায় গাধা—শিস দিলে যায় বিশ মাইল)
সেই গাড়িতে কর্তা সেদিন কুটুম বাড়ি যাচ্ছিলেন ;
ঘোমটা দিয়ে রোগনো-ভরা ঘুগনিদানা খাচ্ছিলেন।
দেখলে তাঁকে পথের মানুষ হাসতে থাকে পাঁচ জনেই ;
ট্যাক্সি চালক লাগায় ধমক,—সূর্যবাবুর গ্রাহ্য নেই।
সঙ্গে ছিল লৌকিকতা একটি হাঁড়ি রস করা ;
হঠাৎ জীবন পালটে দিল বিরূপ বিধির মস্করা।
মীর্জাপুরের গলির ভিতর পথের ধারে রেস্তোরাঁয়
খাচ্ছিল চা ও-অঞ্চলের গুণ্ডা নায়ক কেষ্ট রায়।
গাধার গাড়ির মধ্যে দেখে ঘোমটা ঘেরা চাপদাড়ি—
'জয় মা কালী' ব'লে পথে প'ড়ল সে এক লাফ মারি।
এক নিমেষে ঘিরল গাড়ি সঙ্গীরা তার দাঙ্গাবাজ,
'মরদ হয়ে মেয়ে সাজার শাস্তি পহুঁচাঙ্গা আজ।'
গতিক দেখে ইসমাইলের খাঁচা-ছাড়া প্রাণপাখী :
'আল্লা' ব'লে লম্বা দিলে, 'আগে নিজের জান রাখি।'
'পুলিস, পুলিস' সূর্যবাবু তোলেন কাতর আর্তরব ;
কোথায় পুলিস ! কেষ্ট বলে, 'পুলিস নেবে কার তরফ,
হুঁস আছে কি ? পাগলা গারদ থেকে তুমি পালিয়ে যে
আসছ না তো প্রমাণ কি তার ?' বন্ধুরা তার চালিয়েছে
ততক্ষণে দশ হাতে কাজ। মুক্তি পেয়ে জোড় গাধা
ছুট দিয়েছে আট পা' তুলে। 'এটা শহর কলকাতা,
মগের মুলুক নয়কো, এবং আমিও নই কেউ কেটা
বুঝিয়ে দে'ব।' কেষ্ট বলে, 'আমরা সকলেও সেটা

টের পেয়েছি, কীর্তি তোমার শুনেছি অদ্ভুত আগে,
আজ ন্যাকামি ঘুচিয়ে দে'ব ; মারের চোটে ভূত ভাগে,
ডাণ্ডা খেলেই ঠাণ্ডা হবে তোমার মাথার ভূত যত।
পাগলামি সব উঠবে সিকেয়।' মুষ্টি ক'রে উদ্যত
সূর্য বলেন, 'সব কটাকে পুরব জেলে কেস করে।'
কেষ্ট বলে, 'তার আগে আয় ভদ্রলোকের বেশ ধরে।
টান মেরে আজ ছিঁড়ব দাড়ি, নথ-পরা নাক কাটক ঠিক।'
চারদিকেতে লোক জমেছে—কম করে বিশ জন পথিক
দেখছে মজা। সূর্য বলেন, 'দেখুন মশাই আপনারা,
মানছি আমার ধরণধারণ লাগছে সবার খাপছাড়া ;
ব্যক্তিগত যার যা রুচি সেই-মতো তো চলবে সে ?'
বলতে বলতে একটা ঘুঁসি লাগল চোখের কোল ঘেঁষে,
রদ্দা আর এক পড়ল ঘাড়ে, ঘোমটা ছিঁড়ে ফরদা ফাঁই !
'পুলিস, পুলিস !' ছোকরাগুলোর মোটেই চোখের পরদা নাই।
বোগ্‌নো হাঁড়ি উজাড় করে আনন্দে ফীস্ট লাগিয়েছে,—
পথের লোকও ভাগ পেয়েছে। ঘাড়ের ব্যথা চাগিয়েছে,
সূর্য হাঁকেন, 'দিনদুপুরে জুলুমবাজী গুণ্ডামি
চলছে দেখেও বলছ না কেউ একটা কথা ? খুন আমি
হলে বাধা দেবার সাহস নেইকো কারো ? সব ভ্যাড়া'
চটল এবার পথ-সমিতির সভ্য এবং সভ্যারা ;
জানিয়ে দিল, ঠুকবে কোর্টে মামলা যখন মানহানির
বুঝবে মজা। কেষ্ট বলে ভরসা দিয়ে, 'প্রাণহানির
নেই কোনো ভয়, নথবাবাজী ; দেশের লোকে পাচ্ছে লাজ
অন্য সবার মতোই তুমি চলবে সবাই চাচ্ছে আজ।
বাইরে ঘরে ভদ্রভাবে থাকতে হবে আজ থেকে ;
নইলে পরে পুড়বে দাড়ি নাকটি যাবে মাঝ থেকে।'
'পুলিস, বাঁচাও !' কেষ্ট বলে, 'আসতে পুলিস রাত হবে,
হোক না আগেই নাকের সঙ্গে ক্ষুরের মোলাকাৎ তবে ?
পুলিস মোদের পাত্তা পেলে জেল দেবে তো ! দূর কহো !
নাকটি গেলে ফিরবে না আর, জীবন হবে দুর্বহ।'

ক্ষুর নিয়ে এক নাপিত এল ; পুলিস কোথাও নাই দেশে
রকবাজেরা ঘিরে তাঁকে নাচছে নাচন রাইবেঁশে।
'অনেকদিনের বদ্-অভ্যাসও ছাড়তে খারাপ মনটা হয়।'
কেষ্ট বলে, 'করব মোরা অপেক্ষা আধঘণ্টা নয় ;
কিন্তু আমার হুকুম তামিল না হয় জেনো যতক্ষণ—
কান ধ'রে 'ওঠ-বোস' করাবে তোমায় ওরা ততক্ষণ ;
তারপরে নাক কাটবে তোমার, বাঁচায় দেখি কোন মিয়া !
বাঁদর সাজা চলবে না আর মানুষ হ'য়ে জন্মিয়া।'
বল'তে বল'তে দু'জন এসে টান দিল দুই কান ধ'রে।
দয়াবারির আশা বৃথা শুখনো মরুপ্রান্তরে।
সূর্যবাবুর মুখ শুকোল, উপচে দু'চোখ নামল জল ;
জোড়হাতে ক'ন, 'ঘাট হয়েছে মাপ করো আজ বাপ সকল।
কী চাও বলো', কেষ্ট বলে, 'ত্যাগ ক'রে সব কুমতলব
হোন স্বাভাবিক।' কান ছেড়ে কয় 'ক'রব মোরা মহোৎসব,
নথবাবাজীর শ্রাদ্ধে খা'ব মিষ্টি' ক'জন সঙ্গী তার।
'অস্বাভাবিক জীবন-যাপন ছা'ড়ব' ক'রে অঙ্গীকার
সূর্য নামেন গাড়ির থেকে ; বসিয়ে তাঁকে রেস্তোরাঁয়
চুলদাড়ি গোঁফ কামিয়ে দিলে নাপিত দিয়ে কেষ্ট রায়।
নথটি খুলে মনের ভুলে বুকপকেটে রাখলে সেই ;
ব্লাউজ খুলে নিজের জামা পরালে চোখ পা'কলে সেই।
পাঞ্জাবীটা তেলচিটে আর ধুতিটা আধময়লা হোক—
ভালোই হ'ল দেখতে, খুশি পথজোড়া ছাদময় যা লোক
বলব কি আর ! চারপাশেতে হুলুধ্বনি হাততালি।
খুঁজতে গাধা ছুটল ক'জন ; গাড়িটা এমজাদ আলি
রাখলে নিজের আস্তাবলে আপাততঃ শঙ্কা নাই ;
ফিরিয়ে দেবে আসলে নিতে বাবুর চাকর রামকানাই।
একশ টাকা ট্যাক্স দিতেই (ফীস্টি খরচ) নিন্দাবাদ
থামল লোকের, উঠল ধ্বনি 'সূর্যবাবু জিন্দাবাদ।'

রইল কথা বাড়িতে তাঁর চাল-চলনের খোঁজ নেবে
কেষ্ট—যদি হয় প্রয়োজন—ওষুধ কড়া 'ভোজ' দেবে।

কথার মানুষ স্বর্যবাবু ; রাখতে কথা সেইদিনই
জানিয়ে দিলেন চাল-চলনে আগের মানুষ নেই তিনি ।
বাড়িতে তাঁর ভদ্রভাবে আসবে যাবে সর্বজন—
দেয়াল কেটে দোর ফোটালেন চারদিকে তাই চার ডজন ।
মই সরালেন, বুজিয়ে দিলেন সুড়ঙ্গপথ সেই গভীর ।
অন্দরেতে মেয়েরা রয়, ছাগলগাধার নেইকো ভিড় ।
লাইব্রেরিতে সারি সারি আলমারিতে বই আছে ;
গোঁফদাড়ি রোজ নিজেই কামান—'সেফটিরেজর' হইয়াছে ।
রান্নাঘরে হাঁড়ি, নেছেন গ্যাসের উনুন প্ল্যান ক'রে ;
রাত্রে জ্বলে 'নিয়ন' আলো,—গ্রীষ্মে ঘরে 'ফ্যান' ঘোরে ।
শীতের সময় লেপটি মুড়ি দিয়ে এখন তৃপ্তি পান ;
গিন্নী পরে 'বেনারসী' করেন প্রাণে দীপ্তিদান ।
স্বর্যবাবু বাথরুমেতে সাবান মেখে স্নান করেন ;
ঘরজামাইয়ের পাল না পুষে সুপাত্রেতে দান করেন ।
সাঁতার শেখেন হেদোয় গিয়ে ; মাথার চুলে 'ব্রাশ' করা ;
ড্রয়িংরুমে দেশবিদেশের পুতুলছবি । পাশ করা
সেক্রেটারি টাইপ করে । মোটর আছে, ফোন আছে ;
কারবারে তাঁর কেষ্ট রায়ের দলের কয়েকজন আছে ।
গুরুকে দেন গরদগিনি এলেই প্রণিপাত করি ;
কেষ্ট রায়কে প্রেজেণ্টেশন—দামী সোনার হাতঘড়ি—
কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পাঠিয়ে দেছেন ; স্বর্য সুর
তার কৃপাতেই সুখে আছেন দিয়ে থুয়েও সুপ্রচুর ।
বদলে গেছে সবই, কিন্তু স্বভাব লোকের বিশ্রী তো !
'নথবাবাজী' নামটি আজও হয়নি সবাই বিস্মৃত ।

লিকলিকে ঠ্যাংঠেঙে এক জিরাফ-খুকু। নাম তার গ্রীবা। গ্রীবার মনে ভারি দুঃখু। এমন সুন্দর গলা আমার, তা মা-বাবা একখানা হার দিলে না গা!

মনের দুঃখু মনে চেপে গ্রীবা গাছতলায় দাঁড়িয়ে নিচ-ডালের পাতাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। মা ডাকলে সাড়া দেয় না। বাবা ডাকলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

বাবা বলে, মেয়েটার কী হয়েছে বল তো?

মা বলে, কি জানি। হয়ত ভিন-জাতের কাউকে পছন্দ-টছন্দ হয়েছে। জেব্রা, কিম্বা হরিণ কিম্বা রামছাগল।

বাবা বলে, তাহলে তো মুস্কিল।

একদিন সকালবেলা গ্রীবাকে কোথাও পাওয়া গেল না। মা-বাবা আঁতিপাঁতি খুঁজলে। কোথাও মেয়ে নেই।

গ্রীবা চলেছে একা একা ঠ্যাং ফেলে ফেলে ঘাড় গলা দুলিয়ে দুলিয়ে।

ফুলগাছ ডেকে বললে, অ গ্রীবু, চললে কোথা?

গ্রীবা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, যেদিকে দুচোখ যায়।

ফুলগাছ বললে, আহা এমন সুন্দর গলা তোমার। একটি হার হলে মানাত ভাল।

গ্রীবা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

টুনটুনি পাখি সেইমাত্র বাসাটুকু থেকে বেরিয়ে ফুলগাছের মগডালে বসে ভোরবেলাকার প্রথম দোলটি দুলে নিচ্ছে, ফুলগাছ বললে, টুনটুনিয়া, মুনমুনিয়া, ফুল দিচ্ছি, কুঁড়ি দিচ্ছি, পাতা দিচ্ছি, মঞ্জরী দিচ্ছি, সব দিয়ে আমার গ্রীবারানীর জন্যে একখানি চমৎকার হার বানিয়ে দে তো।

টুনটুনি বললে, বেশ তো। বলে ঠোঁটের সুতো দিয়ে ফুলকুঁড়ি পাতা মঞ্জরী সেলাই করে করে জুড়ে জুড়ে সূর্যমুখীর ধুকধুকি দিয়ে চমৎকার একখানি হার তৈরী করলে। ফুলগাছ সেই হারখানি দু-ডালে গ্রীবার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে।

এবার আয়নায় দেখ তো গ্রীবু।

গ্রীবা চোখ-টোখ মুছে জলের ধারে গিয়ে ঘাড় নিচু করে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে দেখছে আর বলছে, 'ঈস, কি চমৎকার দেখাচ্ছে আমাকে'—বলতে বলতে হারটি ঝুপ্ করে জলে।

সেই হার নিয়ে জলের মধ্যে কাড়াকাড়ি—কুমীরে কচ্ছপে মাছে কাঁকড়ায়। সবাইকার কাছ থেকে কেড়ে-কুড়ে নিয়ে নদী হার নিয়ে ফেলল গিয়ে একেবারে সমুদ্দুরে—যেখানে সমুদ্দুরের রাজার মেয়ে খেলনা খেলতে খেলতে তিমির ফোয়ারায় চান করছিল, সেইখানে তার কোলের ওপর। ঝিনুক-টিনুক ফেলে মেয়ে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বললে। বাবা কি চমৎকার হার দেখ, নেব? বাবা বললেন, দাঁড়াও, কার হার কি বৃত্তান্ত আগে খোঁজ নি।

একদিন গেল, দুদিন গেল, সাত দিন গেল, গ্রীবা সেই নদীর ধারে বসে আছে তো বসেই আছে। কবে নদী আমার হার ফিরিয়ে দেবে। টুনটুনির মুখে খবর পেয়ে গ্রীবার মা এসেছে, বাবা এসেছে, দাদা এসেছে, দিদি এসেছে। সবাই মিলে কত সাধাসাধি, গ্রীবা বাড়ি চল্। ফুলগাছ বলে, গ্রীবুরানী রাত পোয়াক, আলো ফুটুক, পাখিরা গাক, ফুল ফুটুক, টুনটুনি তোমাকে আবার ওর চেয়েও সুন্দর হার তৈরী করে দেবে। এখন বাড়ি যাও।

গ্রীবার সেই এক কথা। উঁহু, ঐ হারই চাই।

কুঁড়ি-উঁকিঝুঁকি পাতা-চিকচিক
লালে-সাদায়-নীলে-হলুদে ঝিকমিক
ভোরের কুমকুমে মাখামাখি
সারা বনের প্রাণীর অবাক-হয়ে-মুখ-তাকাতাকি সে—ই হার।

মুস্কিল বলে মুস্কিল। মহামুস্কিল। রামছাগল পছন্দ হলেও না হয় দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু জলের তলায় কোথায় আছে হার—সাত যোজন না সত্তর যোজন দুরে—কে বা আনে খোঁজ, কে বা দেয় খবর। যে দিতে পারত, সে তো ঢেউ-কাপড়ের কুঁচি সামলাতে-সুমলোতে সামলাতে-সুমলোতে আপনার মনে বয়েই যাচ্চে বয়েই যাচ্চে, যেন—আমার এই জলের কাঁড়ি ছেলেপুলের বাড়াবাড়ি কোথায় রাখি তার ঠিক নেই, তার ওপর পাড়ের যত গাছ, ছোট বড় উড়ন্ত-বসন্ত পাখি ছায়া ফেলবে, ডালপাতা কুটোকাটি ফেলবে, সে স—ব বইচি, বৃষ্টির ফোঁটাদের কাটাকুটি খেলার শ্লেট—সে-ও এই আমি, তার ওপর আবার কে চোখের জল ফেলল, কে হার ফেলল—সে সব-ও খোঁজ রাখতে হবে? না বাপু, আমার সময়ও নেই সাধ্যিও নেই, ইচ্ছেও নেই।

কি করা যায়, কি করা যায়।

এক-চক্কর ডুব-সাঁতার দিয়ে এসে পানকৌড়ি বললে, একটা ডুবুরির পোষাক হলে চেষ্টা করে দেখতাম। একটা যুঁই-যুঁই গন্ধের পায়ে-চলা রাস্তা যেন পুবমুখো নেমে গেছে বলে মনে হল।

কচ্ছপ বললে, আমি পারি। কিন্তু একটু······দেরি হবে।

সবাই মনে মনে বললে, তদ্দিন গ্রীবু বাঁচলে হয়!

গ্রীবার বাবা একটু কেশে ঘাড় চুলকে বললে, না, না, আপনি কেন এই শরীরে কষ্ট করে……

এমন সময় নদী থেকে ভুস্ করে দোঁতো মুখ বাড়ালে……কে রে? না, আমি হাঙর। সমুদ্দুরের রাজার দূত। এই নদী থেকে ভেসে ভেসে এক হার গিয়ে পড়েছে সমুদ্দুরের রাজার মেয়ের কোলের ওপর। রাজার মেয়ে সেই হার নেবার জন্যে বায়না ধরেছে। কিন্তু কার হার কি বৃত্তান্ত না জেনে—তোমরা কেউ কি জান সেই হারের খবর?

সবাই বললে, হার তো আমাদেরও হারিয়েছে। কিন্তু তোমাদের হারটি কেমন তা না জানলে বলি কি করে?

হাঙর বললে—

মুক্তো-প্রবাল-সোনা-মানিক-ইন্দ্রনীল আর পান্না—
কোন্ কারিগর গড়লে এ হার রাজা ভেবেই পান্ না।
রাজকন্যা কাঁদছে কাঁদুক—কাঁদেই অমন কান্না,
মালিককে হার ফিরিয়ে দেবেন, এই হল তাঁর পণ। 'না। ও হার আমাদের নয়'—

সবাই বলে উঠল। আমাদের গ্রীবারাণীর হার হল—

কুঁড়িতে-পাতায়-ফুলে-মঞ্জরীতে ঝকমকে,
যেমন আকাশের হাঁসুলি চাঁদ
যেমন পাহাড়ের সাতনরী ঝরণা
যেমন মেঘের কণ্ঠী ইন্দ্রধনু তেমনি।

হাঙর মুখের মধ্যে থেকে একটা আঁকিবুকি কাটা অশথ-পাতা বের করে বললে, নয়? কিন্তু আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা যে লিখছেন?—আচ্ছা, তাহলে নিয়েস তোমার হার।

বনময় হৈ চৈ। সোজা কথা নয়। জিরাফ-খুকুর কান্নার জোরে সমুদ্দুরের রাজার আসন টলেছে! ভালুক-গিন্নী লোম-ঘোমটা টানতে টানতে বললে, মরে যাই। আমরাও তো অমন দিনের মধ্যে পঁচিশবার চোকের জল ফেলি, তা এঁদের লোমের ডগাটিও তো নড়ে না। উল্টে চেঁচানির চোটে বাসায় কাক-পক্ষী বসুক দিকি! যে যায় যাক, আমি বাপু যাচ্ছিনে তামাশা দেখতে।

সারা বন জড় হয়েছে নদীর ধারে—যেন মেলা। কিম্বা খেলা। অবশ্য কেউ কাউকে মারছে না—ধরছে না। হাতিরা খরগোশেদের পাশে গা মেরে গুটিসুটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি বাঘ-বাঘিনীও ভদ্রতা করে হরিণ টরিণকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। ভালুক-গিন্নীকেও দেখা গেল কর্তার পেছন পেছন উই চিবোতে চিবোতে এসে হাজির। সবাই উদ্‌গ্রীব। কি হয় কি হয়। এমন ঘটনা তো সচরাচর ঘটে না।

হঠাৎ জলের রং বদলে গেল। কালো জল আলো হয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে জলের মধ্যে থেকে ভেসে উঠল এক শঙ্খ-গড়ন সোনার নৌকো। সেই নৌকোর মোদ্দিখানটিতে এক ঝিনুক-ঝালর মুক্তোর সিংহাসনে বসে আছেন—আঁশের কাপড় পরনে, ফেনার চাদর গায়, আট পা উঁচু অক্টোপাসের

মুকুট মাথায়, কচ্ছপে পা, তিনপাশে তিন শুশুকের তাকিয়ায় গা—বিশাল সমুদ্দুরের রাজা, আর তাঁর কোলে বসে আছে তাঁর ঢেউ-ঢেউ চুল একরত্তি মেয়ে, মুখখানি শুকিয়ে আমসি, তার হাতে দুলছে এক আশ্চর্য হার।

ঐ তো আমার হার, বলে গলা বাড়িয়েই গ্রীবা দেখলে, একি! সব যে পাথর!

লাল টুকটুক ফুল আর মঞ্জরীগুলি হয়ে গেছে মাণিক আর প্রবাল।

সাদা কুঁড়িগুলি হয়ে গেছে মুক্তো।

পাতাগুলি পান্না।

নীলফুলগুলি ইন্দ্র নীল।

আর অমন সুন্দর নরম পাতলা কোমল ডাগর সূর্যমুখীটি কিনা শক্ত নিরেট বিশ্রী সোনা।

যাচ্ছে তাই! চাই নে আমার ও হার—বলে গ্রীবা আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

টুনটুনি আর ফুলগাছ ছাড়া সবাই অবাক! এমন হারের লক্ষ্মী কেউ পায়ে ঠেলে? পাচ্ছিস যখন, নিয়ে নে। আর তোরই হার যখন।

গ্রীবার দিদি বললে, ফুলের হার তো শুকিয়ে যেত তিনঘণ্টায় বাপু। এমন জিনিস আর পাবি নে, নে নিয়ে নে গ্রীবু। আর তুই না পারিস আমরা তো আছি।

সমুদ্দুরের রাজা অনেক সাধাসাধি করলেন। এমন কি কাঁদ কাঁদ মুখে মেয়েও। কিছুতেই নিল না গ্রীবা।

তখন রাজার মেয়ের মুখে হাসি ফুটল। দুই দিকে দুই পাখা বের করে একটা আলোর পক্ষীরাজের মতো জলের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল রাজার নৌকো।

ভালুক-কত্তা ফিসফিসিয়ে বললে, দেখলে? আসতে তো চাইছিলে না।

গ্রীবা বাড়ি ফিরে গেল।

অনেকদিন পরে এক কাক-জ্যোচ্ছনার রাতে সেই বিশেষ সংবাদ-দাতা জিরাফটির সঙ্গে গ্রীবার যেদিন বিয়ে হল, সেদিন টুনটুনি-পাখি তার বৌ-ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ধরাধরি করে উড়িয়ে নিয়ে এল যে জিনিসটি, সেটি দেখে গ্রীবা তো অবাক।

কুঁড়ি উঁকিঝুঁকি পাতা-চিকচিক
লালে-সাদায়-নীলে-হলুদে ঝিকমিক
সাঁঝের কুমকুমে মাখামাখি
সারা বনের প্রাণীর অবাক-হয়ে-মুখ-তাকাতাকি

সে—ই হার। এমন কি তার চেয়েও সুন্দর, কেন না এ হারে সূর্যমুখীর ধুকধুকি ছিল না, তার বদলে সমস্ত হারটি জুড়ে ধুকধুক করছিল জোছনার রূপোলী জরিতে জড়ানো ছোট্ট টুনটুনির সোনার হৃদয়খানি।

কি মুস্কিল!

কর্তা চাকরকে বললেন, 'থিয়েটার দেখতে গেলি, এর মধ্যে ফিরে এলি যে? ভালো লাগলো না?' সে বললে 'না কর্তা, ভালো খুবই লাগছিল, কিন্তু অতদিন অপেক্ষা করা গেল না। প্রোগ্রাম কিনেছিলুম, তাতে গল্পটা দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অঙ্ক আর তৃতীয় অঙ্কের মধ্যে তা'তে লেখা আছে 'এর মধ্যে এক সপ্তাহ কেটে যাবে!'

সুধীন্দ্র সরকার

নফরচন্দ্রের বেড়াল

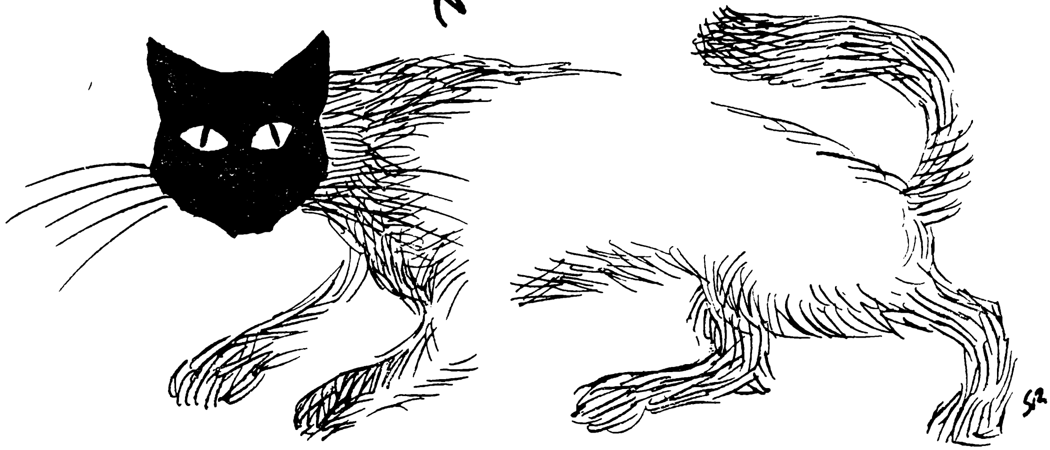

নফরচন্দ্র আলের পথ ধরে হাঁটছিল। দু'পাশে ধূ ধূ করছে ধানক্ষেত। বিচালির টুকরো এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থেকে সাক্ষী দিচ্ছিল আবাদি জমির।

মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইল নফর। সেই সঙ্গে ওর পা দুটোও চলতে শুরু করল জোরে।

বাড়ি পৌঁছতে এখনও চারক্রোশ পথ বাকী। অবিকল দেখতে বাটির মত চাঁদটা চলতে লাগল ওর সঙ্গে।

—মিঁয়াও! ম্যাঁ-ও !!

চমকে পেছনে তাকাল নফর। মুখে একটু হাসির রেখা টেনে দেখল, একটা বেড়াল ওর পাশে হেঁটে চলেছে। কখন থেকে যে বেড়ালটা পিছু নিয়েছিল নফর মনে করতে পারল না। চলতে চলতে মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করল নফর।

মুখটা ওপরে তুলে, নীল-আলো-জ্বলা মনিদুটো একবার ঘুরিয়ে বেড়ালটা ডাকল আরেকবার··· মিঁয়াও!

বেড়ালটা কি বলতে চায়? নফর বোঝার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

যাকগে, বেড়ালটা যখন একটা সঙ্গী চাইছে—সঙ্গে চলুক না হয়।

নফর আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

বাড়ি পৌঁছুতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকী। গোটা লখিমপুর গ্রামটাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন। শুধু জেগে থাকবে ওর মেয়ে পুনি আর বাড়ির লণ্ঠনটা। ছোটবেলাতেই মাকে হারিয়েছে মেয়ে। সেই থেকে নফরই ওর সব।

আজকের হাটবারে রোজগারটা ওর ভালই হয়েছে। আগে এরকমটা কোনদিন হয়নি! সব মাছ যে বিক্রী হয়ে যাবে, নফর ভাবতেই পারে নি আগে।

হঠাৎ দূরের অন্ধকার পথের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল নফর। কি যেন একটা হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছিল এই দিকে! একটা ঝাপ্‌সা ছায়া আলের পথ ধরে!

ভাল করে চোখ দুটো কচলে নিল নফর। যেটা এগিয়ে আসছিল সেটা অন্য কিছু নয়, একটা মানুষ।

লোকটা কাছাকাছি এসে পড়লে পর, নফর ভাল করে চিনতে চেষ্টা করল; কিন্তু পারল না।

ভাবল, কোন ভিনগাঁয়ের মানুষ হবে। কিংবা ভিখিরী টিকিরী। কিন্তু, যদি চোর-ছ্যাঁচোর হয়? আজকাল চোর ডাকাতের যা উপদ্রব বেড়েছে গ্রামে!

নফর চিৎকার করল—কেডা? কেডা আসে এদিকে?

কোন সাড়া এল না ওপাশ থেকে। লোকটা যদিও ওর কাছাকাছি ছিল তখন।

কোমরে টাকার গোঁজে কাপড়ের একটা প্যাঁচ বাড়িয়ে দিল নফর। লোকটাকে কাছ থেকে দেখে চমকে উঠল। শুধু চমকে ওঠা নয়, ভয়ও পেল একটু।

চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছিল লোকটার কোমরে। আলোটা কিসে লেগে যে ঠিক্‌রে পড়ছিল, তা জানতে ওর এতটুকু দেরী হল না। জিনিসটা চিনতে অসুবিধা হল না ওর। রামদাটা বেশ বড় সড়! এককোপে যে কোন একটা মানুষের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে ফেলতে পারে!

নফরের মুখোমুখি পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। চড়া গলায় বলল—এ্যাই বের কর কি আছে?

মুখ ভেংচে নফর বলল—বের করব আবার কি?

—বটে! বলেই কোমর থেকে টেনে রামদাটা বার করতে গেল লোকটা। কিন্তু পারল না। উল্টে ওর ডান হাতটা কাঁপতে শুরু করল থর থর করে।

নফর ততক্ষণে দু'পা পেছনে সরে এসেছে।

লোকটার চাউনি দেখে নফরের মনে হল, লোকটা নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। না হয় কোন ব্যামো আছে। নইলে সুস্থ লোক ঐভাবে কাঁপবে কেন?

কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো নফর বুঝতেই পারেনি।

লোকটার চোখের সামনে তখন এক ভয়ংকর দৃশ্য! নফরের পাশে যে বেড়ালটা লেজ গুটিয়ে বসে পড়েছিল, সে হঠাৎ আয়তনে বড় হতে শুরু করেছে। সাদা লোমের ওপর কালো দাগগুলো, ডোরাকাটা বাঘের রঙে বদলে যাচ্ছে। একহাত লম্বা বেড়াল চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ছ'হাত লম্বা বাঘের আকার নিয়ে বসল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে। লম্বা লেজটা বারবার আছাড় মারছিল মাটিতে। আর গলায় আওয়াজ করছিল—গরর-গরর!

ভয়ে বিস্ময়ে লোকটা ভ্যাবাচ্যাকার মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ও কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না, বেড়াল কি করে বাঘ হতে পারে?

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হল না ওকে।

আগুনের ঢেলার মত চোখের মণিদুটো ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসতে শুরু করল ওর দিকে !

ব্যাপার দেখে লাফ মারল লোকটা। পরক্ষণেই ছুটতে শুরু করল ডানদিকের ধানক্ষেত পেরিয়ে। দূর থেকে ভেসে এল আর্ত চিৎকার—বাঁচাও ! বাঁচাও ! খেয়ে ফেললো।

লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে বেশ অবাক হল নফর। যে লোকটা ওর প্রাণ নিতে এসেছিল, সে নিজেই পালাল প্রাণ বাঁচাতে !

লোকটা অন্ধকারের বুকে মিলিয়ে যেতেই নফর হেসে উঠল চিৎকার করে। তাকিয়ে দেখল বেড়ালটা চুপ করে বসে আছে। আর লেজ নাড়ছে আগের মত।

আবার হাঁটতে শুরু করল নফর। পেছনে বেড়াল।

বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে নফর যখন বাড়ির চৌকাঠে পা রাখল, তখন দশটা বেজে গেছে।

খিড়কির দরজা খুলে উঠোনে পৌঁছুতেই কানে এল ফোঁপানির শব্দ। পুনি কাঁদছিল দাওয়ায় বসে।

মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল নফর।

বাবাকে কাছে পেয়ে বেড়ে গেল পুনির কান্না। কাঁদতে কাঁদতে বলল—বাবা পুষি মরে গেছে !

—সে কি ! কখন ?

—সকালে, তুমি চলে যাবার একটু পরেই। পুনি ফোঁপাতে লাগল।

বুকটা টন্ টন্ করে উঠল নফরের। মনে পড়ল, বেড়ালটা দু'দিন ধরে কিছু খাচ্ছিল না। ছাইগাদায় পড়েছিল মুখ গুঁজে।

ছাইগাদার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল নফর। গত দু'দিন যে ভাবে পড়েছিল, সে ভাবেই পড়ে আছে বেড়ালটা। শুধু দেহে প্রাণটুকু নেই ! থাবাদুটো সামনের দিকে ছড়ানো। নখগুলো বেরিয়ে পড়েছে থাবা থেকে। গায়ের লোম শজারু কাঁটার মত খাড়া খাড়া !

মরা বেড়ালটা দেখতে দেখতে নফরের চোখ দুটো ভিজে উঠল। প্রায় পাঁচবছর বেড়ালটা ছিল ওদের বাড়ি। মেয়েটা বড্ড ভালবাসতো ওকে !

—মিঁয়াও ! হঠাৎ কানে এল সেই পরিচিত ডাক। চমকে উঠল নফর। মরা বেড়াল আবার ডাকে নাকি ? কিন্তু, তক্ষুণি ওর মনে পড়ল রাস্তার বেড়ালটার কথা। যেটা ওর সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল।

চকিতে ঘাড় ফেরাল নফর। দৌড়ে গেল খিড়কির দরজার দিকে। পথে নেমে এদিক ওদিক খুঁজলও অনেক।

কিন্তু না, বেড়ালটাকে কোথাও খুঁজে পেল না !

ছোট্ট বাবু মুঠোভর্তি টফি নিয়েই অন্য হাতটা বাড়ায়—'অনীতের জন্যে?' ও মুঠোয় টফি ভরতে ভরতে মামু বলেন—'অনীতটি কে?' শুনে মা আর দিদিভাইয়ে চোখোচোখি হয়। একটু হেসে মা বলেন—'অনীত? অনীত বাবুর বেস্ট ফ্রেণ্ড।'

বাবু একমিনিট দাঁড়িয়ে উত্তরটা শুনে নেয়। তারপরেই একগাল কচি হেসে ছুট লাগায়। মামু ঘরে বসেই শুনতে পান, বারান্দায় অনীতের সঙ্গে গল্প করছে বাবু।

'—জানিস অনীত, দিল্লি থেকে আমার মামু কলকাতায় চলে এসেছেন। এই দ্যাখ আমাকে কত্তো টফি দিয়েছেন—তোকেও। নিবি? এই নে।' কিন্তু অনীতটা আচ্ছা অসভ্য ছেলে তো? কিচ্ছুই বলে না। একটা থ্যাংকিউ পর্যন্ত না। বাবুই আবার বলে—'পকেট ভরে রাখ। রেখে, চল আমরা ক্রিকেট খেলি। আমি কিন্তু এম. সি. সি. তুমি ইণ্ডিয়া। আচ্ছা? হেড, অর টেইল্? টেইল! হল না, হলনা, হলনা! বেশ। তুমিই তবে ওপ্‌ন করো।'

সারাদিনই বাবু অনীতের সঙ্গে খেলা করে। সারাটা দুপুর। যতক্ষণ না দিদিভাই ইস্কুল থেকে ফিরছে। যতক্ষণ না জগন্নাথদাদা এসে বলছে—'চলো বাবু গা মুছবে, দুধ 'খাবে চলো।' বাবুর যে সকালে ইস্কুল। তারপরে সারাটা দিন পড়ে থাকে লম্বা হয়ে। বিকেল যেন আসতেই চায় না। বাবু ঘরের মধ্যে করবেটা কী? মা তো রোজ বেরুতে দেবেন না। ভাগ্যিস অনীত ছিল! ভাগ্যিস অনীত আসে? অনীতেরও দিদি ইস্কুল থেকে ফেরে বিকেল বেলায়, ততক্ষণ সে খেলা করে বাবুর সঙ্গে। বাবু আর অনীতে খুউব ভাব। বাবুই বরং মাঝে মধ্যে অনীতকে একটু বকাঝকা করে। মা যদি বাবুকে বকেন, বাবুর মন মেজাজ ভালো থাকে না, সেদিন বাবু গিয়ে অনীতকে একটু বকে দেয়। অনীত কিন্তু খুব লক্ষ্মী ছেলে। বকুনি খেয়ে উলটে ঝগড়া করে না। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে এই যা তখন আবার বাবুকেই তো সান্ত্বনা দিতে হয়, ভোলাতে হয়। আবার অনীতও বাবুকে ভোলায় মাঝে মাঝে। এই তো সেদিন বাবু নীল কাঁচের ফুলদানিটা ভেঙে ফেলে খুব ধমক খেল। বাবু গিয়ে

অনীতের কাছেই তো দুঃখু করলো, 'জানিস ভাই অনীত, আমার কী দোষ? জগন্নাথভাই ফুলদানিটা একদম টেবিলের ধার ঘেঁষে রেখেছে আমি ছুটে যাচ্ছি, ফুলটুলগুলো শার্টের কোণে লেগে জড়িয়ে গিয়ে ব্যস ফুলদানিশুদ্ধ মাটিতে পড়ে ফটাস্। আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি? বল্? মার কি আমাকে অত বকুনি দেওয়া ঠিক হয়েছে?'

অনীত বলে—'না ভাই বাবু। তোমাকে সত্যি অতো বকা উচিত হয় নি। ইচ্ছে করে তো আর ওটা ভাঙোনি তুমি? অমন কতো হয়। মাসিমারই তো সেদিন হাত থেকে চায়ের প্লেটটা পড়ে গেল, কই মাসিমাকে কি কেউ বকেছিল? বড়রা অমন অন্যায় কাজ করেই থাকে। এসো আমরা খেলা করি। তুমি ও নিয়ে আর মন খারাপ কোর না।'

—বাবু আর অনীত ফোনেও গল্প করে। দিনে চোদ্দবার ফোন করছে বাবু অনীতকে। যখন তখন। অনীত অবিশ্যি মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকে না। পিসিমনির বাড়িতে যায়। কিংবা পার্কে কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই থাকে।—'অনীত, জানিস, আমাকে একটা এয়ার-গান কিনে দিয়েছেন কাকু। দেখবি? সত্যি সত্যি এয়ারগান!'

অনীত বলে—'দেখি, দেখি!'

—'তবে আয় আমাদের বাড়িতে!'

—'দাঁড়া আগে মাকে জিজ্ঞেস করে নি।'

অনীতের মা খুব ভাল। কক্ষনো বারণ করেন না। বাবু ডাকলেই অনীত চলে আসে। যতক্ষণ খুশি থাকে। বাবুকে যখন মা ঘুম পাড়ান, অনীতও শুয়ে পড়ে বাবুর পাশটিতে, বাবুর বালিশে মাথা দিয়ে। দুজনে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে। কতো গল্প। পিসিমনির বাড়ির গল্প। ইশকুলের গল্প। মামাবাড়ির গল্প।

অনীত বেশি গল্প বলে না। অনীত গল্প শোনে। অনীতকে গল্প বলে বলে ফুরোতে পারে না বাবু। ভূতের গল্প, চোরের গল্প, বাঘশিকারের গল্প। সব গল্পই অনীতের কাছে নতুন। সব গল্পই সে হাঁ করে শোনে। মাঝে অবশ্য ওর ইশকুলের গল্প বাবুকে শোনায় অনীত। ওদের ইশকুলটা অন্য হলেও অনেকটা বাবুদেরই মতো। অনীতের আন্টিরা ঠিক যেন বাবুর আন্টিদের মতো।

কিন্তু দিদিভায়ের সামনে অনীত একদম যেতে চায় না। দিদিভাইকে ও ভীষণ লজ্জা পায়। একদিন ওদের গল্প শুনে দিদিভাই ফিক্‌ফিক করে হেসে দিয়েছিল, সেই থেকে অনীত দিদিকে দেখলেই লুকিয়ে পড়ে। খাটের নীচে, টেবিলের তলায়, কিম্বা আলমারির কোণে, যেখানে হোক। কিছুতেই যাবে না দিদির সামনে। মার কাছে অবিশ্যি যায়। মা তো হাসেন না। অনীতের সঙ্গে বাবু যখন গল্প করে মা চুপ করে শোনেন। শুনতে শুনতে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েন কখনও কখনও।

শুধু তো গল্প নয়। হুড়োহুড়িও কম করে বাবু অনীতের সঙ্গে? এই ঘরটাই ওদের খেলার জায়গা। এই ঘরের আধখানা জুড়ে আছে দাদু ঠাকুমার বিশাল খাট। আর সেই খাটের পুরোটা

জুড়ে বাবু অনীতের বিপুল রাজত্ব। এ খাটটা কি এমনি-এমনি অন্য অন্য খাটের মতো? মোটেই না। এতবড় খাট, এত উঁচু খাট, পৃথিবীতে আর কোথাও আছে? কী সুন্দর, কতো চওড়া, কতো উঁচু। বাবু অনীতকে নিয়ে সারাদিন এখানে খেলে। মস্ত মস্ত থামের মতন পায়া, তাতে আবার থাবার মতন নোখ খোদাই করা আছে, মাথার ওপরে চারটে ছত্রি বাঁধা আছে বারোমাস, সেখানে মশারি টাঙানো হয়। খাটের তুদিকে ইয়া চওড়া ইয়া উঁচু আঙুরলতা পদ্মলতা কারুকার্য করা কাঠের পাঁচিলের মতন হাতল। তার ওপর দিয়ে বাবু দিব্যি হাঁটতে পারে, মাথার ওপরে ছত্রিতে হাতও পৌঁছে যায় সেখানে উঠলে। খাটটাতেই কত খেলা জমে। তার নীচে অন্ধকারে ঢুকে খেলো, তার ওপরে উঠে বালিশ বিছানা নিয়ে খেলো, মশারিটাকে নামিয়ে নিয়ে খেলো। মশারি কখনও তাঁবু, কখনো পাল, কখনো জঙ্গল, কখনো রাজবাড়ি। অনীত আর বাবু সব খেলা জানে। তারপর খাটের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়ে দৌড়ে, তারপর খাট থেকে ধুপধাপ লাফিয়ে মেঝেয় পড়ে, তারপর খাটের পায়া বেয়ে গাছের মতন উঠে উঠে—ক-তো খেলা! খাটটা নিয়ে বাবুর ভয়ানক গর্ব। সে অনীতকে প্রায়ই গর্ব করে বলে—'জানিস্ অনীত, এটা না, আমার দাত্নঠাকুমার বিয়ের খাট। ওই যে ঐখানে, ঐ ত্থাখ, আমার দাত্ন-ঠাকুমা!' দেয়ালে চন্দন-পরানো ফ্রেমের ভেতরে তখন দাত্ন-ঠাকুমা অনীতের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসেন :—'দেখেছিস? দাত্ন নয় মস্ত বড় শিকারী ছিলেন। ওই ত্থাখ যত হরিণের শিং দেয়ালে, যত বাঘের মুণ্ডু। স-ব একলা দাত্নর শিকার! হুঁ বাবা! আমিও বড়ো হলে দাত্নর মতন মস্ত শিকারী হব।' অনীত বড় বড় চোখে চেয়ে চেয়ে বাবুর মধ্যে এখনই দাত্নর মতন মস্ত বড় শিকারীটাকে দেখতে পায়। বাবুও নতুন এয়ারগানটা হাতে করে আয়নার সামনে দাঁড়ালে সেই মস্ত শিকারী সাহেবকে দেখতে পায়, অনীত যাকে মুগ্ধ চোখে ত্থাখে।

বাবু-অনীতের দস্যুপনার শেষ নেই। তুপুরবেলায় এই ঘরটার ভেতর তারাই রাজা। সেদিন কলম্বাস-কলম্বাস খেলবার সময়ে মা তুধের ডেকচি হাতে ঘরে ঢুকে পড়লেন। অমনি বাবু চীৎকার করে উঠেছে—'ওকি! ওকি। মা!—সাবধান! ডুবে যাবে যে! এটা তো গভীর সমুদ্র এ্যাটলান্টিক ওশ্যান! অনীত—শিগগির মাকে একটা জেলেডিঙি ফেলে দাও—মা, মা, চট করে উঠে পড়ো, এই লাইফবোট!'—শুনেই মার সামনে একটা বালিশ এসে ধুপ করে মেঝেয় পড়ে। —'ওই যে, মা, লাইফবোট!'—শুনেই মা এক জবর ধমক লাগান। 'কী হচ্ছে বাবু? দেখছো না হাতে গরম তুধ! অমন করে চমকে দিতে হয়? যদি পড়ে যেত? পুড়ে যেতুম না আমি? সবসময়ে খেলা!'—সেদিন একটু লজ্জা পেয়েছিল অনীত। বাবুকে পরে বকেছিলো—'সত্যি বাবু, তুমি বড্ডো বেশি হুড়োহুড়ি করো। গরম তুধের ডেকচিটা খেয়াল করতে হয় তো? যদি মা পুড়ে যেতেন?'—বাবু অবিশ্যি মার বকুনিতে দমে না গিয়ে তক্ষুনি মাকে বলেছিলো —'আচ্ছা মা, আচ্ছা এখন আর কলম্বাস কলম্বাস খেলা হচ্ছে না। এখন বেশ সমুদ্রমন্থন খেলা হচ্ছে। বালিশটা হলো মৈনাক পর্বত আর ঘরটা সমুদ্র—আর তুমি হচ্ছো মোহিনী, তোমার হাতে ওটা অমৃতের কলসি, আচ্ছা? অনীত হচ্ছে অসুরদের রাজা, আমি দেবতাদের রাজা। কেমন?' মা হেসে ফেলে বলেন—'সত্যি বাবু! পারিসও বাবা তুই!' বাবু

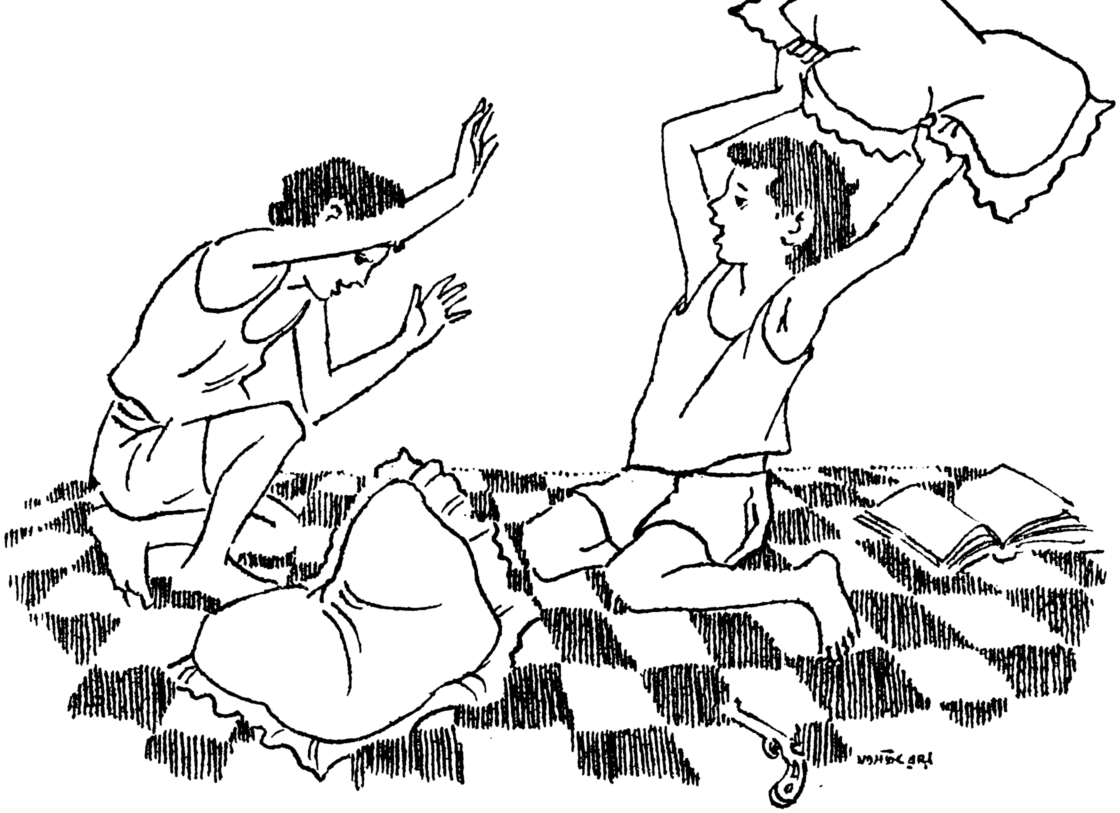

ককিয়ে ওঠে—'বাবু ! বাবু আবার কে ? আমি তো ইন্দ্র !' এই ঘর কখনো সাহারা, কখনো সমুদ্র, কখনো মহাকাশ। এখানে অনীত আর বাবুর অন্তহীন হুল্লোড় লেগেই আছে। যতক্ষণ দিদিভাই না ফিরছে। মা বলেন 'বাব্বাঃ—ঘরের কী হাল করেছে ছেলে ! খাটের ওপরে দিনভর যেন যুদ্ধ হচ্ছে !'

সব সময়ে কি আর গল্প করা ভাল লাগে কখনো খাটটা হয় বেদুইনদের তাঁবু, কখনো হয় জাহাজ কখনো এরোপ্লেন। কখনো সত্যি সত্যি যুদ্ধক্ষেত্র। বালিশ দিয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ হয় বাবুতে আর অনীতে অনীত খুব বাধ্য ছেলে, কেবল একটাই তার দোষ। যখন ট্রাইসাইকেলটা নিয়ে ঘরের ভেতরে সাইকেল-রিকশা চালানো হয়, অনীত কিছুতেই রিকশাওলা হবে না। সে কেবলই প্যাসেঞ্জার। বাবু বেচারি কোনোদিনই প্যাসেঞ্জার হাতে পায় না। সে রোজ রোজই রিকশাওলা। অথচ বাবু যখন বেদুইন হয় অনীত তখন কখনো কখনো উট হয়েছে। তাছাড়া অনীত কোনোদিন কলম্বাস হতে চায় না, বাবুকে কলম্বাস হতে দিয়ে অনীত কেবল একজন নাবিক হয়েই খুশি। কিংবা চাঁদে গেলে অনীত কেবল রকেট-টার ড্রাইভার হয়ে চাঁদের পথের চারিপাশে চক্কর দেয়, বাবু গিয়ে চাঁদের পাথর কুড়িয়ে আনে। সেসব দিকে অনীত সত্যি খুব ভালো। শিকার শিকার খেললে বাবুকে বাঘ, গণ্ডার, গরিলা মারতে দিয়ে সে মারে হাঁসজারু, ওরাংওটাং, খেঁকশিয়ালি। অসভ্য বর্বরদের দেশে যখন বাবু অভিযান চালায় অনীত

সবসময়ে তার দেহরক্ষী এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়। বাবু হয় ফেলুদা, অনীত কখনো তোপ্‌সে কখনো জটায়ু।

আগে বাবু যখন ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার ছিলো, তখন অনীত ছিলো মোহনবাগান। আর মোহন-বাগান প্রত্যেকবার হেরে যেত। এখন শ্যাম থাপা ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে গেছে বলে বাবুও ইস্টবেঙ্গলে নেই। শ্যাম থাপা নাকি কাকুর বন্ধু, তাই বাবু শ্যামথাপার দলেই থাকতে ভালোবাসে। এখন বাবু নিজে মোহনবাগানের পক্ষে কেবলই ফটাফট গোল দিয়ে দেয় ত আর অনীত বেচারা ইস্টবেঙ্গল হয়ে গিয়ে অনবরতই গোল খায়। সব খেলাতেই এমনি। খাট থেকে লাফ দিয়ে ধপাধপ মাটিতে পড়বার খেলাটায়। তাতেও সে বেচারা সবসময়েই খাটের কাছাকাছি পড়ে। কখনো বাবুর মতো এক্কেবারে হনুমানের মতো একলাফে সে-ই আয়না আলমারির কাছে পৌঁছতে পারে না। খাটের হাতলে উঠে যখন মাথার ওপরের মশারিটাঙানোর ছত্রি ধরে ধরে ওরা ট্রাম হয়ে হাঁটে, তখন অনীত হয় প্যাসেঞ্জার, বাবুকে কণ্ডাকটর হতে দিয়ে। খাটের নিচে ঢুকে যখন ওরা ইস্কুল ইস্কুল খেলে, অনীতই সবসময়ে ছাত্র হয়, টিচার হয় বাবু। সেদিক থেকে অনীতের মতো ভালো বন্ধু আর হয় না।

তবু বাবুর আজকাল মন ভালো নেই। এবার পুজোয় মা বলেছেন বাবুকে একটা ভাই প্রেজেন্ট দেবেন। সেই নিয়ে বাবু ভয়ানক উদ্বিগ্ন। অনীতকে বলে—'দ্যাখ অনীত, আমার জন্য একটা ভাই আনা হচ্ছে। কে জানে কেমন হবে ভাইটা? রুন্টুর ভাইয়ের মত দুষ্টু মুষ্টু হবে কিনা কে জানে? রুন্টুর ভাইটা এমনই সাংঘাতিক বাচ্চা, রুন্টুর স্কুলের বই খাতা সব ছিঁড়ে ফেলেছে, রবার টবার চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে, পেন্সিল তো হাতে পেলেই হল ঠুকে ঠুকে শীষ ভাঙবে। কিছুটি বলবার যো নেই। বললেই এমন চ্যাঁচাবে ঠিক যেন বুথ সাহেবের বাচ্চা, অমনি রুন্টুর মা এসে বকবেন—রুন্টু, আবার ভাইকে কাঁদাচ্ছো। ভাই অনীত। আমার বড্ড ভয় করছে। আমার কিছু ভাল লাগছে না। ভাই-টাই আমি চাই না।'—অনীত চুপটি করে সব শোনে। তারপরে বলে—'কিন্তু বাবু, সব ভাইই যে অমন দুষ্টু হবেই, তার তো মানে নেই? লক্ষ্মী ভাইও তো হয়? তোমার ভাইটা তো ভালো ভাই হতে পারে? তোমাকে দাদা দাদা বলে ডাকবে, তোমার সব কথা মন দিয়ে শুনবে, তোমার সঙ্গে সব সময়ে খেলা করবে, এমনও তো ভাই হতে পারে?'—হ্যাঁ, তা যদি হয়, তবে অবশ্য বাবুর আপত্তি নেই। তবু মনে শান্তি নেই, কে জানে, ভাইটা কেমন স্বভাবের হবে। ভালো না, দুষ্টু। বাড়িতে না আসা অবধি জানবার তো উপায় নেই।

মা যখন নার্সিং হোমে ভাইকে আনতে গেলেন, অনীত তখন বাবুর কাছে সারাক্ষণ থাকলো এসে। সারাক্ষণ ওকে সান্ত্বনা দিলো—'দেখিস বাবু, তোর একটা খুব লক্ষ্মীসোনা ভাই হবে।' ভগবানও নিশ্চয় বাবুর মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। বাবু ভাই চায়না শুনে ভগবান তার জন্য একটা বোন পাঠিয়ে দিলেন। বোনকে নিয়ে মা যখন বাড়িতে এলেন, বাবুর আনন্দের শেষ রইলো না। ও মা! এ্যাত্তোটুকুনি বোনটি? এ যে একটা ডলপুতুল? বাবু দৌড়ে গিয়ে বারান্দার কোণে ভাঙা ইঁটটার ফোকরে মুখ গলিয়ে ডাকে—'অনীত, অনীত!' অনীত আসে।—'জানিস আমার কী সুন্দর একটা বোন হয়েছে, ঠিক একটা বিলিতি ডলপুতুলের মতন। গোলাপফুলের মতন হাতপা মুখ—

কী ছোট্টো ছোট্টো আঙুল, যেন প্রদীপের সল্‌তে! আবার তাতে নোখও আছে! আরো ছোট্টো, শাদা, যেন ঝিনুকের কুচি বসানো। কত্তোটুকুনি একফোঁটা নাক, ছোট্টো ছোট্টো ঠোঁট, আর একখানাও দাঁত নেই। মুখটা একদম ফোকলা, আমাদের ঘুঁটেউলি বুড়ির মতন। আর ভুরুও নেই, জানিস? কেবল ন্যাড়া কপালে এই বড় বড় দুটো কালো কালো চোখ।' অনীত অবাক হয়ে শোনে।—'চল্ দেখবি চল্। কী সুন্দর! বোনটি কিন্তু একদম কাঁদে না কেবল খিদে পেলে একটু ওঁয়াও ওঁয়াও করে ডাকে—ঠিক বেড়াল ছানাদের মতন।'

বোনের গল্প শুনে অনীত কিছুই বলে না। চুপ করে বোনকে ছাখে। বাবু উচ্ছ্বসিত,—বলে 'কিন্তু বাপ্‌রে! ঘুমটি যদি ভেঙে যায়, অমনি সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে।' বোনও যে বুথ সাহেবের বাচ্চা হতে জানে! মা তাই বারণ করেছেন, দুপুরবেলায় একদম হুড়োহুড়ি করা চলবে না। খাটে খেলা বন্ধ। খাট থেকে লাফানোও বন্ধ। বোন চমকে চমকে ওঠে কিনা। বাবু-অনীত আর খেলতে পারে না দাদু ঠাকুমার বিয়ের খাটে। ওদের খেলবার জায়গার ঠিক মধ্যিখানে দুদিকে দুটো পাশবালিশের পাঁচিল ঘিরে তার মাঝখানে রাজকন্যের মতন শুয়ে আছে তুলতুলে ফুরফুরে বোনটি। মা বলেন—'বাবু, বোনের দিকে একটু নজর রেখো তো। দুষ্টুমি কোরো না যেন দুপুর বেলাতে! বোন যেন কাঁদে না।'

আর বাবু কী বলে? বাবু হাঁটু ভাঁজ করে, পেছন উঁচু করে কনুইয়ের ওপরে ভর দিয়ে দুই হাতের পাতায় মুখ রেখে ডেঁয়ো পিঁপড়ের মতো হয়ে খাটে বোনের পাশে বসে। বসে বলে—'ও আমার বোন বোনিয়া, ধনধনিয়া, মনমনিয়া, টুনটুনিয়া, ও আমার কুতুর-কাতুর, পুতুর-পাতুর, ইল্লু বিল্লু ওল্লু, ও আমার সুন্টি বোনটি' তার আদরের ঘটা শুনে মা হাসুন না বাবুর তাতে ভারী বয়েই গেল। বাবু এখন একদম অনীতের সঙ্গে খেলা করবার সময় হয় না। খেলবে কখন? বোনের দিকে নজর রাখতে হবে না? বাবু না দেখলে বোনটিকে কে দেখবে? দিদিভাই তো ইশকুলে। মার কতো কাজ! বাবু বোনের পাশ থেকে নড়ে না। বোনকে সে কতো গল্প শোনায়। বলে—'বোনটি সোনা, চাঁদের কোনা, জানো কি তুমি কে? তুমি আমাদের 'স্নো হোয়াইট!' কিন্তু তোমার গল্পটা একটু আলাদা। তোমার গল্পে কোনো দুঃখু নেই। কেবল ভালো ভালো জিনিস। তোমার তো সৎমা নেই। আর আমার মতন একটা বড়ো দাদাই আছে যখন তোমার, তখন তোমার আর ভাবনা কী? জগতের কোনো ডাইনির সাধ্যিই নেই তোমার একটুও ক্ষতি করে দেয়। আসুক না দেখি একটা ডাইনি! এয়ারগান দিয়ে এক মিনিটেই তাকে দেব শেষ করে! তুমি ভয় পেওনা বোনটি? ঘুঁটেউলিকে অবিশ্যি একটু ডাইনি-ডাইনি দেখতে, কিন্তু সে আসলে খুব ভাল লোক। তোমারই মতন ফোকলা মুখে সে যেই হাসবে, অমনি তুমি বুঝতে পারবে যে ও একটুও ডাইনি না। বোনটি, জানো, যেই তুমি একটু বড়ো হবে না, অমনি তোমাকে আমি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে সাই-বেরিয়ায় বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। সা-ই-বে-রি-য়া—উড়ো হাঁসেরা যেখান থেকে আসে-সেই অনে—ক দূরে।' বোনটি কিছুই বলে না। কেবল ফিক্ ফিক্ করে হাসে, আর গোল গোল মুঠো

নেড়ে বাবুর ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি ধরে অন্যমনস্কভাবে হ্যাঁচকা টান মারে।—বাবু কাত্‌রে ওঠে—'উ হু হু হু হু—বোনটি! ওকি ভাই, ওকি ভাই, চুল টানেনা, ছিঃ!' কিন্তু রাগ করবে কি করে? বোনটি ঠিক যে একটা রসগোল্লার মতো! গোল গোল হয়ে শুয়ে থাকে, চার হাতপা এক সঙ্গে শূন্যে তুলে। নাকের সামনে দুইপা দুই মুঠোয় ধরে ট্যারা হয়ে সে কী গম্ভীর তাকানো! দেখে বাবু হেসে কূল পায় না।

—'ও বোনটি, ও মুন্টি-মুন্টি, কুন্তি-খুন্তি, ও কত্তর-মত্তর-ফত্তর—বড় হও না একবার, তোমাকে আমি আমার রিকশায় প্যাসেঞ্জার করে ফেলবো, দেখো না! আর রকেট চালানোর সময়ে তুমি হবে কো-পাইলট—কেমন? আর যখন তুমি ক্রিকেট খেলতে শিখবে, তখন মাঝে মাঝে তুমিও এম. সি. সি., আবার মাঝে মাঝে আমিও এম. সি. সি., পালা করে,—কেমন?' বোনটি সব কথাতেই হাতপা ছুঁড়ে হাসে। কিছুই বলে না।

মামু আসেন বোনকে দেখতে। বাবুর মুঠো ভরে টফি দিয়ে বলেন—'কই ওহাত দেখি, অনীতের টফি—'

বাবু একগাল লাজুক হেসে বলে—'অনীত? অনীত আর আসেনা মামু।'

—'সেকি? কী হল তার?' মামু জিজ্ঞেস করেন ব্যস্ত হয়ে।

বাবু অম্লানবদনে জানায়—'ওরও একটা বোনটি হয়েছে কিনা। খেলবে কখন? বোনের দিকে নজর রাখতে হবে তো? তুমি বরং বোনের জন্যেই একটা টফি দাও। দাঁত উঠলে খাবে।'

অভিনব কুরুক্ষেত্র

ভবানীপ্রসাদ দে

হিঙ্গুলগঞ্জে যাত্রার আসর বসেছে। গঞ্জের মাঝখানে একটা পাকুড় গাছের তলায় প্রতি বছর শীতলা পূজো হয়। সেই উপলক্ষ্যে গঞ্জের ব্যবসাদাররা মহা ধুমধাম করে তিন রাত যাত্রার আসর বসায়।

যে সময়ের গল্প, তখনকার দিনে গ্রাম-গঞ্জের লোকে বিজলী বাতির নামই শোনেনি। গান-যাত্রার আসরে পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলত। এক একখানা পালা সারা রাত ধরে অভিনয় হত তখন। রাত ন'টা নাগাদ যাত্রা আরম্ভ হত। ভোরবেলা যখন ভুক্কো তারা ফুটত, পুব আকাশ ফিকে হয়ে আসত, তখন যাত্রার আসর ভাঙত।

প্রথম রাতে লঙ্কাদহন-পালা জমেছিল দারুণ। অশোক বনে বন্দিনী সীতা সেজে সবারি মনে দুঃখু দিয়ে জয় মা কালী বিড়ি কারখানার ফটকে নামে রোগা-প্যাটকা ছেলেটা আসর মাৎ করে দিল। হনুমান সেজেছিল বিশালাক্ষী দশকর্ম-ভাণ্ডারের মালিক অম্বিকা সাহা। সে-ও কিছু কমতি গেল না। হনুমান যখন লেজের গোড়ায় সত্যিই একটু আগুন ধরিয়ে আসরে ভীষণ দাপাদাপি শুরু

করে দিল, তখন ঘন ঘন হাততালিতে সামিয়ানা ফেটে পড়ে আর কি! হিঙ্গুলগড়ের কেউ কোনোদিন এমন যাত্রা দেখেনি।

পরের রাতের পালা দুর্যোধনের উরুভঙ্গ। সেদিন দর্শকের ভিড় একটু বেশীই হল। সন্ধ্যে হতে না হতেই যাত্রার আসরের চারদিকে অগুনতি মানুষের ভিড়। যে যার মতন জায়গা দখল করে বসে গিয়েছে, কাছাকাছি দোকানঘরগুলোর ছাদেও খালি মানুষ আর মানুষ। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কনসার্ট বেজে উঠল উঁচু তালে।

এমন সময় আসরের বাইরে একটা চাপা গোলমাল শোনা গেল। দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থেমেছে। কোচম্যান তার জায়গা থেকে নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরল। ভিতর থেকে নেমে এলেন সদরের মুন্সেফ উইলিয়াম র‍্যাঙ্কিন আর তাঁর ন'বছর বয়সী মেয়ে লিজ্জা। যাত্রার আসরের মুরুব্বিরা প্রায় দৌড়ে এসে সাহেবের চারপাশে ভিড় জমালেন। ওঁদের মধ্যে পোস্ট-মাস্টার নরহরি তালুকদার কোনো মতে একটু ইংরিজি বলতে পারেন। তিনি সাহেবকে বললেন, 'গুড নাইট, হুজুর।'

সাহেব গলা খাঁকরিয়ে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আপনাদের যাত্রা দেখতেই এলাম। আমার মেয়ের ঝোঁক চেপেছে নেটিভদের যাত্রা দেখবে।'

'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা এসেছেন।'

র‍্যাঙ্কিন সায়েব বললেন, 'আজ সকালে গোবর্ধন সামন্ত আমার কুঠিতে ঘোড়ার দানার দাম

আনতে গিয়েছিল। সে-ই আমার মেয়ের কাছে গল্প করেছে কাল নাকি যাত্রায় খুব মজা হয়েছিল। আজও নাকি খুব মজার পালা। মেয়ে না এসে ছাড়ল না।'

গোবর্ধন সামন্ত হিঙ্গুলগঞ্জের হাটে ভুষিমালের বড় আড়তদার। তার আড়ত থেকে রোজ মুন্সেফের ঘোড়ার জন্যে দানা যায়। মাস কাবারে সে সায়েবের কুঠিতে গিয়ে দাম নিয়ে আসে। সায়েবের মুখে গোবর্ধনের কথা শুনে মুরুব্বিরা নিজেদের মধ্যে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

যাত্রার আসর বসাতে যা খরচপাতি হয়, গোবর্ধন প্রত্যেক বছরই তাতে মোটা টাকা চাঁদা দেয়। সেই সুবাদে এবার পালায় সে একটা বড় পার্ট দাবী করেছিল। কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা তাকে বড় জোর একটা প্রহরীর পার্ট দিতে চেয়েছিলেন। তাতে সে খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, 'আমার সঙ্গে মস্করা! দাঁড়াও, জব্দ করছি তোমাদের।' সায়েবের বাড়ি গিয়ে সেই গোবর্ধন যাত্রার নিন্দে না করে প্রশংসা করেছে শুনলে কে আর অবাক না হয়?

দর্শকদের মধ্যে আর তিলধারণের জায়গা ছিল না। যাত্রার আসরের একদিকে হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসন বসানো হয়েছিল। ঠিক তার উল্টো দিকে র‍্যাঙ্কিন সায়েব আর তাঁর মেয়ের জন্যে আরও দু'খানা চেয়ার পড়ল। এ ছাড়া তাঁদের বসাবার কোনো উপায় ছিল না।

আবার নতুন করে কনসার্ট বাজল। তারপর সখীর নাচ হল, আর তার পরেই পালা শুরু হল।

হিঙ্গুলগঞ্জের যাত্রার আসরে পেট্রোম্যাক্সের আলোয় ইংরেজ রাজার ক্ষুদে বিচারক হস্তিনাপুরের রাজপুত্রদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন। শেষ রাতে যখন কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধন আর ভীম সামনা-সামনি হলেন, তখন হঠাৎ মুন্সেফ সায়েবের মেয়ে কেঁদে ফেলল। দু'হাতের চেটোয় হাতমুখ ঘষে রীতিমত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

সায়েব তার কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে মেয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'বড্ড ঘুম পেয়েছে বুঝি? এক্ষুনি যাত্রা শেষ হয়ে যাবে। তখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোবে।'

কাছাকাছি দু'চারজন দর্শক এগিয়ে এসে শশব্যস্ত হয়ে খোঁজ নিতে শুরু করল, 'হুজুর, মেয়ে কাঁদে কেন?'

'দুর্যোধনের দাঁত কিড়মিড় করা দেখে কি ভয় লেগেছে?'

'হিঙ্গুলগঞ্জের বোলতার মত বড় বড় মশা কামড়ে দিল বুঝি?'

'না-কি, ভিড়ের মধ্যে থেকে কোনো পাজি লোক ছেলেমানুষের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙিয়েছে?'

অবশেষে লিজা মুখ খুলল। বলল, 'বিচ্ছিরি যাত্রা! এতে হনুমান কোথায়? হনুমান এখনও এল না কেন?'

ঠিক সেই সময় সাজঘরের দিক থেকে হনুমানের সাজে একটা লোক আসরে এসে লাফিয়ে পড়ল। দুর্যোধন আর ভীম দু'জনেই পার্ট ভুলে গিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। হনুমান-বেশী লোকটা দুর্যোধনের সামনে গিয়ে তাকে শাসিয়ে বলল, 'আরে আরে দুর্যোধন দুরাচার, মারিয়া করিব

তোকে কুলের আচার।'

ভীম কাতর কণ্ঠে বলল, 'গোবর্ধন, তুই কী পাগলামি শুরু করলি? মহাভারতে হনুমান কোথা থেকে আসবে? আমিই তো দুর্যোধনের উরু ভাঙব।'

হনুমান বেশী গোবর্ধন তাকে ধমকে উঠল, 'চোপরাও!'

বেগতিক দেখে ভীম আর দুর্যোধন দু'জনেই সাজঘরের দিকে পা বাড়াল গুটি গুটি করে। হনুমান তখন একাকী আসরে বীর-বিক্রমে লম্ফঝম্প করতে লাগল। র‍্যাঙ্কিন সাহেবের মেয়েটা সেই দৃশ্য দেখে খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগল। লিজা তার বাবার পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে হনুমানের দিকে ছুঁড়ে দিল। হনুমান ওরফে গোবর্ধন সেটা তুলে নিয়ে নমস্কার করল তাকে।

লোকজন তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, ধর, 'ধর পাজিটাকে! সব পণ্ড করে দিল।'

ধরবে কাকে? গোবর্ধন ততক্ষণে লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে অন্ধকারে পগার পার!

আসরের এক পাশে সারি দিয়ে বসা বাজনদাররা হঠাৎ অকারণে কনসার্টের একটা গৎ বাজিয়ে দিল।

হিসেবের কড়ি

বিখ্যাত গীতিকার গ্লাক প্যারিসের একটা ছোটো দোকানে জিনিস কিনতে ঢুকে অসাবধানতাবশতঃ একটা শার্সির কাচ ভেঙে ফেলেন। অপ্রস্তুত হয়ে তিনি দোকানদারকে বললেন, 'শার্সিটার দাম কত? আমি দিয়ে যেতে চাই কেন আপনার লোকসান করব?' দোকানদার বললে 'মাত্র এক ফ্রা।' গ্লাক একটা দু ফ্রা'র মুদ্রা দিলেন দোকানদারকে এক ফ্রা মুদ্রা ছিল না তাঁর কাছে। দোকানদার বললে, 'ভাঙানি তো হবে না।' গ্লাক বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? আমি হিসেব শোধ করে দিয়ে যাচ্ছি।' হাতে ছড়ি ছিল, এক ঘায়ে আর একটা শার্সি ভেঙে দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন দোকান থেকে।' দোকানদার অবাক্।

আমার বাবার আরো খবর

মহাশ্বেতা দেবী

'ন্যাদোশ'* লেখার পর থেকে মনে হচ্ছে আমাদের বাড়ির আরো খবরাখবর লিখে ফেললে পারি। বাবা একবার মুরগি পুষেছিলেন, সেই কথাটাই বলতে বসেছি, কিন্তু তার আগে তোমাদের জানা দরকার রংপুর থেকে এই শহরটায় আসার সময়ে কি কি ঘটেছিল।

সবচেয়ে ছোটবোন শারীর বয়স তখন পনেরদিন। সময় ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারি। বাঘা শীত। যুদ্ধের সময়। বাবা কাকে জানিয়ে রেখেছিলেন; রেলবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হবে। রাণাঘাটে একটা লোক পেল্লায় চেঁচিয়েছিল, 'কোন গাড়িতে লম্বা বাবু, খুদে গিন্নি, সাতটা ছেলেমেয়ে আর একটা পনের দিনের খুকি আছে?'

এমনি করে ডেকে সকলকে নামানো হয়েছিল, কিন্তু দু মাসের কুকুর জিভার কথা বলা হয়নি, সেও ছিল। রাণাঘাট থেকে আবার যখন ট্রেন ছাড়ল, তখন রাত। জিভা নেই ধরে নিয়ে ভীষণ হইচই হল আর আমার চার বছরের ভাই টান্টু লাইনে নেমে গেল। বুঝতেই পারছ, ষোল বছরের মিতুল থেকে পনের দিনের শারী অব্দি গুণে গেঁথে তোলা সোজা কথা নয়। ট্রেন ছাড়তে বোঝা গেল টান্টু লাইনে। অবশেষে অবু চেন টানল, এবং বাবা চেঁচিয়ে গার্ডকে বললেন, 'কুকুর পেলেন?' গার্ডবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, আপনার ছেলে পেয়েছি।' বাবা বললেন, 'কুকুর কোথায়?' গার্ড বললেন, 'আপনার টুপিতে; আপনারই হাতে, ঘুমোচ্ছে।'

তারপর বাবা বিরক্ত হয়ে 'যত্ত সব!' বলে ঘুম দিলেন। আর এই শহরের স্টেশনে নেমে প্রথমেই 'জল কই; জল?' বলে চেঁচালেন। মা নীরবে একটা বোতল এগিয়ে দিতেই বাবা আবছা আঁধারে এক বোতল কেরোসিন খেয়ে ফেললেন। সব কিছু খুব দ্রুত করতেন বলে, ওঁকে বাধা দেওয়াই যায় নি। তারপর যা চেঁচিয়েছিলেন, সেই গর্জন শুনেই ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ঘুম ভেঙে চলে এসেছিল।

* সন্দেশ, ভাদ্র-আশ্বিন—১৩৮৩

এমনি করে এ শহরে আসা। আসার কিছুদিনের মধ্যেই বাবা ও মার দল ভাগাভাগি হয়ে গেল। তখন আবার বাড়িটা ঠিকমত চলতে লাগল।

বাবার খুব বিশ্বাস ছিল বাড়িটা কাদায় তৈরি, বাড়িঅলা বলতেন সিমেণ্টে। একবার পাড়ায় খুব বাড়িতে বাড়িতে কপির বীজ লাগিয়ে ফুলকপি চাষের হুজুগ হয়। আমাদের বাড়ির বীজ-টিজ ছিল ছাদে। সেবার বেশ কিছুদিন শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ফেরার পর দেখা গেল, ছাদের সিঁড়ির খাঁজে বৃষ্টির জল-টলের কল্যাণে দিব্যি একটি ফুলকপি ফুটে রয়েছে। তখন বাবার কি আনন্দ। বাড়িঅলাকে দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে কবুল করালেন, 'মাচ আর্থ অ্যানড্ লিটল সিমেণ্ট হ্যাজ মেড ইট পসিব্‌ল্।'

সেবারই ছুটিতে বাড়ি এসে দেখি, বাবা খাদ্যসমস্যা নিয়ে নানারকম ভাবছেন। কিছু করতে পারছেন না, কেননা বাজার করে নারান, রাঁধে সত্যনারায়ণ ঠাকুর। ওরা নামেযশে মার দলে। সত্যনারায়ণ ভাল রাঁধে, কিন্তু বেজায় গোঁয়ার। নারানের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। তখনো ন্যাদোশ আসে নি। জগদেও, যে ন্যাদোশকে বেচেছিল, সেই দুধ দেয়।

জগদেও অফিসিয়ালি মার দলে। কিন্তু সত্যনারায়ণ, নারান আর জগদেওয়ের মধ্যে ভীষণ ভুল বোঝাবুঝি।

দু দিনেই ধরে ফেললাম ওই ভুল বোঝাবুঝিটা বাবাই জীইয়ে রাখেন। সত্যনারায়ণকে বলেন, 'তুই কি করে ভাল রাঁধবি বল্? নারান পচা মাছ আনে।'

নারানকে বলেন, 'সত্যনারায়ণ বলছিল, পচা মাছ আনলে কি ভাল ঝোল রাঁধা যায়?'

ফলে ওরা দুজন দুজনকে সন্দেহ করে। মা বুঝতে পারেন, কোন একটা ব্যাপার চলেছে। যেহেতু মা মেনকাকে জিগ্যেস করেন, মেনকা যথারীতি ভুল খবর দেয়।

আমি সব ফাঁস করে দিতাম, কিন্তু নারান আর জগদেওর মধ্যে ফাটাফাটি হয়ে গেল। নারান বগুড়ার লোক, জগদেও বলে দেহাতী হিন্দী। জগদেওয়ের ছেলেমেয়ে নেই বলে মনে খুব দুঃখ। একদিন সকালে জগদেও দেরি করে দুধ দিতে এল। নারান বলল, 'অ ভাই জগদেও, আইজ দেরি কেন?'

'মন ভাল নেই।'

'ক্যা? মন ভাল নাই ক্যা?'

'কাল রাতে খোঁখী হল।'

'অ! তাতেই মন ভাল নাই? দেখ ভাই, পেরথোমবার খোঁখী হছে, পরে খোকা হবেনে।'

'কেয়া?' বলে জগদেও নারানকে বেজায় ধমক দিয়ে চলে গেল।

নারান বুঝেই পেল না কেন জগদেও চটল। মাকে ও বিকেল নাগাদ জিগ্যেস করল, 'মাও,, (মাকে ও 'মাও' বলত) 'জগদেও চটল ক্যা?'

বিকেলে মা কাগজ পড়তেন, আঙুল দিয়ে কান চুলকোতেন, পান খেতেন। একমাত্র সেই সময় ছাড়া মাকে অন্যসময়ে কিছু বলা খুব বিপজ্জনক ছিল।

মা বললেন, 'মন বলতে ও শরীর বলতে চেয়েছে, খোঁথী বলতে কাসি। ও বলেছে শরীর ভাল নেই, কাসি হয়েছে বলে। তুমি বুঝেছ মন ভাল নেই মেয়ে হয়েছে বলে।'

অতএব সেই এক ছুটিতেই দেখলাম জগদেও আর নারানের কথা বন্ধ। সত্যনারায়ণ হঠাৎ দেশে গেল। একদিন অনীল অবু খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বাবা রান্না করছেন!'

বাবার খাদ্যে মনোযোগের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমার মনে ছিল, ওদের ছিল না। মিতুলেরও মনে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ও চিরকালই বাবার দলে।

মা দেখলাম খুব খুশি। মা হয়ত মজা দেখছিলেন।

বাবা প্রথমেই বললেন, 'তোর মার মেথডে রান্না হয় বলে সব ভিটামিন চলে যায় খাবার থেকে। আজ আমার মেথডে সরপুঁটি মাছ রান্না হবে।'

আমাকে বললেন, 'মিতুল সব জোগান্ দেবে।'

কিছুক্ষণ বাদে মেনকা এসে বলল, 'ট্যাঁড়স আর স্ুঁই-সুতা দাও বড়দি।'

মা বললেন, 'কেন?'

মেনকা বলল, 'বাবু চায়।'

মা মিতুলকে ডাকলেন। মিতুল বলল, 'সরপুঁটি মাছের পেটে ট্যাঁড়সকুচি ভরে ছুঁচ দিয়ে পেট সেলাই করে বাবা জলে সেদ্ধ করছেন।'

খাবার সময়ে দেখা গেল সরপুঁটি মাছের পেট থেকে হড়হড়ে সর্দির মত ট্যাঁড়সের নাল বেরুচ্ছে। মা বললেন, 'ওই ভিটামিনগুলো ফেলে দে, তারপর গরম মুসুর ডাল আর আলুসেদ্ধ আর ঘি দিয়ে খা।'

এর পরদিন বাবা বললেন, 'মাংসের রোস্ট করব। তোর মাকে এদিকে আসতে মানা কর।'

মার বয়ে গেছে রান্নাঘরে আসতে মা পাশের বাড়ির মাসিমার সঙ্গে দু আনা ভাড়ায় খাগড়া চলে গেলেন বেড়াতে। মা এখনো, মানে সেদিনও দু'আনা ভাড়ায় শহর চষে বেড়িয়েছেন। মা চিরকাল বলেন, 'এইত! আমার কাছে ত কেউ বেশি পয়সা চায় না?'

আমরা বলি না, প্রত্যেক রিকশাঅলা পরে বাবার কাছে এসে মুঠো ভরে টাকা নিয়ে যায় বলে মার হাত থেকে দু আনা নেয়। সে এখনো মার কাছে শোনা যায় দু টাকা কিলো মাছ, চার টাকা কিলো মাংস না কি বাবা আনেন। কিন্তু ভাইরা বাজারে গেলেই সব চড়া দরে কিনে আনে।

যাই হোক। রোববারও ছিল। বাবা রোস্ট্ করছেন। আমরা খুব উত্তেজিত। মার হাতের হাঁস বা মাংসের রোস্ট খুবই নামকরা।

একবার বাবা এদিকে ঘুরে গেলেন। ফিক করে হেসে কাকে যেন বললেন, 'এক কোয়া রশুন, এক চামচ ঘি, একটু নুন, আর পাঁচসেরি ঠ্যাঙের রোস্ট। এসে দেখলে পরে হিংসেয় সবুজ হয়ে যাবে।'

ঘণ্টা তিনেক বাদে বললেন, 'আচ্ছা, মাংস আর জলের মধ্যে কানেকশান হচ্ছে না কেন বলত?'

হবার কথাও নয়। কেননা একটা কড়াই, তার মধ্যে সম্ভবত সেই রশুন-ঘি-নুন কোথাও আছে। জলও অনেক। কিন্তু পাঁঠার ঠ্যাং ত পাঁঠারই ঠ্যাং। ঠ্যাং একেবারে স্বাধীনভাবে কড়াইয়ের কানা জুড়ে শূন্যে বিরাজ করছে। তার গায়ে মাঝে মাঝে জলের ধোঁয়া লাগছে বটে, কিন্তু তাতে আর যা হোক, রোস্ট্ হচ্ছে না। সেদিনও মা এসে উদ্ধার করলেন।

তারপর আর কয়েকদিন বাবা কিছু বললেন না। সংসারে ভীষণ মন দিলেন। ফলে অনীশ-অবুর পইতের সময় রাণাঘাট থেকে অনেক নামাবলী আর কুচো সুপুরি এল। পরে নামাবলী দিয়ে বালিশ করতে হয়েছিল। পুজোর সময়ে হঠাৎ চল্লিশগজ একরকম ছিট আর ছটা রিকশায় তিনটে গদী আর তিনটে তোশক এল। কালীপুজোর মিষ্টি 'আই উইল ব্রিং ফ্রম্ ক্যাল' বলে টেলিগ্রাম করে কলকাতা থেকে পঁচিশ বাক্স ফেরাজিনির কেক আনালেন। পুরুত যখন বললেন, 'দেবী পদে বিলাতি মিঠাই'…তখন পুরুতকে ধমকে বললেন, 'শী ইট্‌স্ এভরিথিং'।

মা, মেনকা, নারান সবাই বুঝলেন, গতিক ভাল নয়। সেবারও ছুটিতে এসে দেখি বাবা খাদ্য সমস্যা সমাধানের কথা ভাবছেন।

আমিও চিন্তিত হলাম। কেননা বাবাকে সংসার বাজার এসবে ঢুকতে দেখলে আমার মনে

পড়ে ১৯৪৩ সাল। রাস্তার দু পাশের বাড়ির লোকজন পথে কি যেন দেখছে। একটা ঠেলাগাড়ি আসছে। পেছনে নতুন একটা পেটফোলা ছাতা নিয়ে শূন্যে তুলে ধরে বাবা আসছেন।

সকালে মা বলেছিলেন, 'নিজে বাজারে গেলে বাচা মাছ আসে। লোকজন দিয়ে কি সব হয়?'

ফলে নিমেষে বাবা বাজার করে এলেন। তখন কলকাতায় হরঘড়ি দেখার জিনিস মিলত না। ফলে পাড়াপড়শী আমাদেরই খুব সন্দেহের সঙ্গে দেখত। কেন দেখত, তা আমরা বুঝতাম না। কেননা আমাদের ঘরোয়া জীবন আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হত।

ঠেলা যখন ভেতরে এল, তখন দেখা গেল সবচেয়ে নিচে দশ সের টোমাটো, তার ওপর বিশটা বাঁধাকপি, বেগুন, আলু, পেঁয়াজ সব দশ পাঁচ সের হিসেবে। সবচেয়ে ওপরে সার সার ইলিশ-রুই-ভেটকি-চিংড়ি।

মা বললেন, 'বাচা মাছ?'

বাবা বললেন, 'এই যে? নতুন ছাতা কিনতে হল একটা।'

বলে ছাতার মুখ ছদরে দিলেন। পিলপিল করে বাচা মাছ পড়ে বারান্দায় বিছিয়ে গেল।

মা বললেন, 'কে খাবে?'

বাবা চমৎকার হেসে বললেন, 'দিস ইজ কল্‌ড মার্কেটিং।' পরে অবশ্য বাধ্য হয়েই লোক নেমন্তন্ন করতে হল।

সে সব কথা মা আর আমার মনে ছিল। মিতুলের মগজ কম, ওর মাথায় কিছু থাকত না।

যাই হোক, বছর দুয়েক বাদে আবার বাবার মাথায় ঢুকল খাদ্যসমস্যা।

তারপর, সবাই যখন শান্তিনিকেতনে, তখন শোনা গেল বাবা খাদ্যসমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন। পনেরটা মোরগ আর পনেরটা মুরগি কিনেছেন।

ছুটিতে বাড়ি এসে দেখি, বাবার দলের লোকরা সবাই মার দলে চলে এসেছে। যার বাবা হরিকীর্তন গাইত, সেই যুরোপীয়ান ক্লাবের বাবুর্চি মহম্মদও বলল, 'মুরগি নাকি বেজায় ভীষণ জানোয়ার। বাবু মুরগি পোষার আগে কিছু খোঁজ নিলেন না?'

বাবাও বললেন, 'বুঝলি, মিসক্যালকুলেশান হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'কেন?'

বাবা বললেন, 'মুরগির ওপর ভরসা রাখা চলে না।'

তারপর সব শুনলাম। আমি বড় হলে মাঝে মাঝে আমাকে মনের কথা বলতেন। সব শুনে আমারো খুব দুঃখ হল।

দ্বিতীয় দিনই জোরালো মোরগ দুটো বাকি তেরটাকে খেদিয়ে দেয়। ফলে এপাশ-ওপাশে যারা মুরগি খায়, তারা ক-দিন মোরগের ঝোল খায়। তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বাবার ইচ্ছে যাই থাক, সব মুরগি ডিম পেড়ে তা দিয়ে ছানা বার করে ফেলে। তাড়াতাড়ি বাড়ির অবস্থা দাঁড়ায়, চতুর্দিকে মুরগি ঘুরছে। তারা সবাই বেজায় স্বাধীনচেতা আর রাগী। মোরগরা মোরগদের

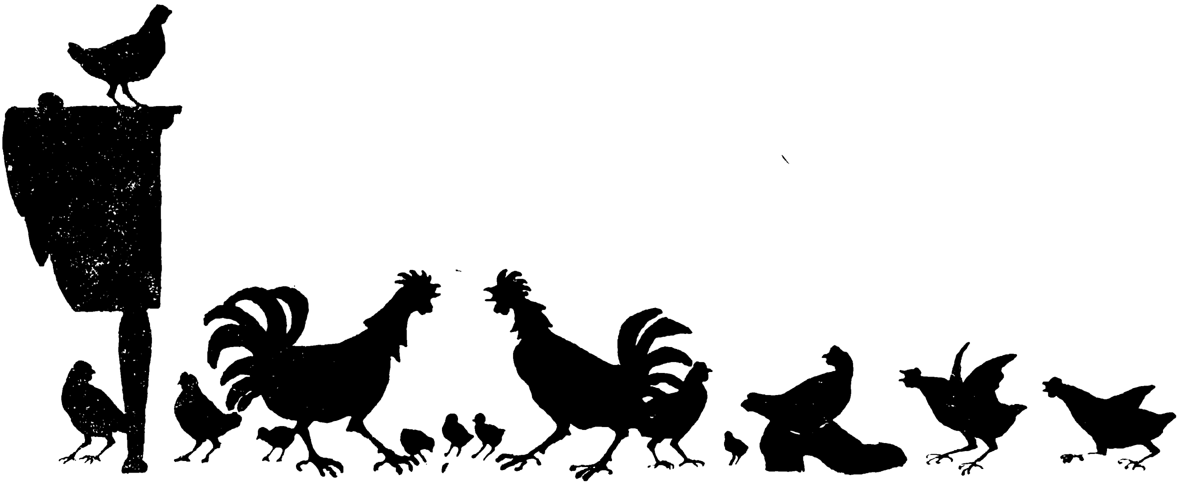

সঙ্গে লড়ে, মুরগিরা মুরগিদের সঙ্গে। ফলে সারা বাড়ি জুড়ে মুরগির পালক আর ময়লা।

আমি বললাম, 'ডিম পাওয়া যাচ্ছে ত?'

শুনলাম তাতেই সব গণ্ডগোল হয়েছে। বাবা বললেন, 'দেখে যা, শুধু দেখে যা, কি বেয়াড়া সব!'

মুরগিগুলো সবাই ডিম দেয় বটে, কিন্তু বাবার মুরগি, বাবার মতই ব্যক্তিত্বে স্বতন্ত্র।

কেউ ডিম পাড়ে জুতোর মধ্যে, কেউ টুপিতে, কেউ ড্রেসিং টেবিলের ওপর। তিনটে মুরগি বাঁশের আড়ায় টাঙানো লেপের উপর চড়ে বিচ্ছিরি কোঁ কোঁ শব্দ করে ডিম পাড়ে রোজ, রোজ সেগুলো গড়িয়ে নিচে পড়ে আর ভাঙে।

সবচেয়ে বাবা যাতে দুঃখ পেয়েছেন, তা হল, ওঁর ঘরে, ফাইলে, একটি প্রিয় মূর্তির পেছনে, সর্বত্র ডিম পাড়ছে মুরগি।

কত মুরগি কত মোরগ, হিসেব রাখাও কঠিন। মা খুবই জো পেলেন। বলতে থাকলেন, 'যে বাড়িতে সবই অদ্ভুত, সেখানে মুরগি পোষা কেন?'

আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, এর কোন সমাধান নেই। বাড়ির পাখি, কেউ প্রাণে ধরে খাবে না। ডিম খাওয়া যাবে, সে আশা দুরাশা। কেননা অর্ধেক ডিম নষ্ট হয়। অর্ধেক ডিম মুরগিরা হিংস্রভাবে পাহারা দেয়। মুরগির জন্যে বাড়িতে হাঁটা চলা দায় হয়েছে। মোরগগুলো সবচেয়ে পাজি। মোরগ ভোরে ডাকে বলে যারা বইয়ে পড়েছ, তারা জেনে রেখ বাবার মোরগরা রাত আটটায় ডাকত, ন টায় ডাকত, দশ টায় ডাকত, মাঝরাতে ডাকত, ভোররাতে ডাকত। ফলে পড়শিরা খুব অসন্তুষ্ট।

বাবা এরপর বাগান টাগান করেন কিন্তু খাদ্য সমস্যা নিয়ে আর ভাবেননি। দুজনেই মুরগির ঠোকর খেতেন বলে বাবা মার কোথায় যেন আপসও হয়েছিল। ন জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে অসংখ্য মুরগি অজস্র ডিম, প্রচুর পালক, প্রচুর ময়লা, অগুনতি ছোট মুরগি-ছানা—বেজায় জটিল হয়েছিল জীবন।

তারপরে একবার রানীখেত না কি ঝিমুনি অসুখ হয়ে টপাটপ মরে গিয়ে মুরগিরা বাবাকে মুক্তি দিয়ে গেল।

এর কিছুদিন বাদেই মা ন্যাদোশকে কেনেন।

নববর্ষের চিঠি

তোমরা সকলে ১৩৮৪ সালের জন্য আমাদের আন্তরিক স্নেহ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। নতুন বছরে তোমাদের খুশি করবার জন্য আমরা কি করতে পারি বল। এ বছর তোমাদের তিন কুঁড়ে সম্পাদকই ধারাবাহিক গল্প লিখেছেন। তা ছাড়া তোমাদের প্রিয় লেখকদের কারো কারো বড় গল্পও জোগাড় করবার চেষ্টা করব। আর কি চাও?

ভাবতে পার, আজ থেকে ৬৪ বছর আগে ১লা বৈশাখ ১৩২০ সালে প্রথম সন্দেশ প্রকাশিত হয়েছিল। তোমাদের লীলাদির সে কথা বেশ মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় উপেন্দ্রকিশোর তাঁর আঁকা মলাট দেওয়া প্রথম সংখ্যাটি হাতে নিয়ে হাসি মুখে ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটের ভাড়া বাড়ির দোতলায় উঠে এলেন। অমনি বাড়িময় আনন্দের ঢেউ উঠল।

দুঃখের বিষয় তোমাদের বড় সম্পাদিকা তখন অ-আ শিখছিলেন, বই টই পড়তে পারতেন না। ছোট সম্পাদিকা আর সম্পাদক মশাই জন্মানই নি। এমন কি সুকুমার নিজেই তখনো বিলেতে পড়াশুনা করছেন! আর সত্যি কথা বলতে কি, বাড়ির ছোটদের কাছে, দোতলার চাইতে এক তলার প্রেসের এলাকাটাই বেশি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল। যদিও সেখানে করুণাবাবু বলে একজন খিটখিটে লোক থাকতেন। এবং সেখানে যাওয়া বারণ ছিল।

সম্পাদিকা বুঝতেই পারেননি যে ঐ দিনটি বাংলা শিশু-সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী দিন। সেই যে একটা উচ্চমান তৈরি করে দিয়ে গেলেন উপেন্দ্রকিশোর, আজ পর্যন্ত কেউ তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। আমরাও তাকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। তোমরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা কর।

এবার একটা মজার কথা বলি। ১৫ বছর আগে আমরা গ্রাহকদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সারা বছরে কোন গল্প সব চাইতে ভালো লাগলো। কে প্রথম স্থান পেল, জান? তোমাদের নলিনীদি! তাহলে বোঝ ব্যাপারটা। এ-বছরও বল দিকিনি কোন রচনাটি সবচেয়ে ভালো লাগলো। সব গ্রাহক-গ্রাহিকারাই এতে যোগ দিও। খাম বা পোস্ট্‌কার্ডের কোনায় লিখো: 'সব চাইতে ভালো লেখা।' সকলে আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জেনো। সঃ সঃ

ইন্সপেক্টর বিক্রম
কাহিনী আবিদ সুর্তি
ছবি প্রতাপ মল্লিক
৬
ওই বাড়িটা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য
সুন্দরলাল, বিজু আর লুক্কা বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়
বিজু, এবারে তোমার পালা।
তোমাকে ওই ওপরের জানালাটায় তুলে দিচ্ছি, তুমি ভিতরে ঢুকে সদর দরজাটা খুলে দাও
ঠিক আছে
কোনো শব্দ কোরনা কিন্তু
বিজু বাড়ির ভিতরে ঢুকে —
—কোনো শব্দ না করে সদর দরজা খুলে দেয়
তুমি এখানে থেক। আমরা এক্ষুনি আসছি
বিজু পাহারায় রইল, কিন্তু হঠাৎ ...
বাতি জ্বালল কে ?
পরমুহূর্তেই একটি বাচ্চা ছেলেকে সাথে নিয়ে দস্যুদল চম্পট দিল
বাড়ির মধ্যে ...
কমলা, ওই — চোর এসেছে!
অ্যাঁ ? চোর ?

হঠাৎ তাদের চোখ গেল একটা চিঠির দিকে
এটা কী ?
সুন্দরলালের চিঠি!
নীলকণ্ঠ মোহন্ত, তোমার ছেলেকে নিয়ে গেলাম। তাকে যদি ফিরে চাও ত আগামী বিষ্যুদবার ত্রিশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে ... সুন্দরলাল
কমলা, কেউ যেন ঘুনাক্ষরেও না জানে। আমি টাকাটা দিয়ে দেব।
কিন্তু ইন্‌সপেক্টর বিক্রমের কানে খবরটা পৌঁছে গেল ...
মোহন্ত, তোমার ছেলেকে নাকি কাল ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে ?
কই, না ত। সেত ছুটিতে বেড়াতে গেছে ...
বিক্রম বোঝে মোহন্ত মিথ্যা কথা বলছে
কিন্তু তোমার ছেলে যে শুনছি দস্যু হয়েছে ?
মোহন্তের কাছ থেকে আসল ঘটনাটা জানার চেষ্টা করে বিক্রম
কাল সন্ধ্যা অবধি তোমার ছেলে এখানে ছিল। কী হয়েছে ঠিক করে বলত — হয়ত তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি
© RANG REKHA FEATURES PVT. LTD., 1976
বিক্রম —
নিজের ছেলের ব্যাপারেই কিছু করতে পারলে না — আর তুমি বলছ আমাকে সাহায্য করবে ?
নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বিক্রম ...
আমাকে সাহায্য করার কি একটা লোকও নেই ?
এদিকে হেড কোয়ার্টার্সে —
কোনো খবর আছে নাকি স্যার ?
চলবে —

ভূতোর ডাইরি

লীলা মজুমদার

(ভুতোর ডাইরির মতামতের জন্য একমাত্র ভুতো ছাড়া কেউ দায়ী নয়। আমরা শুধু বানানগুলো যতটা সম্ভব শুধরে নিয়েছি। বলা বাহুল্য এখানে ডাইরি থেকে শুধু কিছু কিছু অংশ দেওয়া হল। সবটার জায়গা নেই, তাছাড়া দেওয়াও যায় না। সঃ সঃ)

১লা এপ্রিল ১৯৭৬—চোখ খুলেই গা শিউরে উঠল। আজকেও দেখলাম ন্যাড়া পাহাড়ের খাঁজ থেকে সরু সুতোর মতো কালো-পানা ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কুয়াসা থেকে সে একেবারে আলাদা। থাক গে, আমার আর কি। আমার এখন কিছু খাবার পেলেই হল। ছিল-ও যথেষ্ট, মাথার কাছে টিনের বাক্সে মাখন, রুটি, কেকের টুকরো। টেবিলে যা দেওয়া হয়, হোটেলের লোকরা সব খায় না। চাঁদ-সায়েব ছাড়া সবাই তাতে ভাগ বসায়। মেম-দিদি পর্যন্ত। তবে আমি টেবিল থেকে বাসন তুলি, সবার আগে আমিই পাই। বেশি নিই না। খাক্ সবাই। না খাওয়ার যে কত জ্বালা সে আমি হাড়ে হাড়ে জানি। শুধু তাই নয়, শিমলের শীতে এই গরম গলা-বন্ধ কোট, এই পেন্টেলুন, এই মোজা, রবারের জুতো, এ-সব কি কম ভাগ্যির কথা। আর এই ঘরটা! এর মতো জায়গা পৃথিবীতে কোথাও আছে? কি নিরাপদ! এর তিন দিকে পাহাড়ের গা, তাই একটি ছোট দরজা ছাড়া আর দরজা-জানলা নেই। একটা দিক শুধু কাঁচ দিয়ে মোড়া, তার ভিতর দিয়ে কালো মোটা পরদা টেনে দিতে হয়। হোটেলের একতলার পিছন দিকের সব ঘরই এই রকম। আমারটা এক কোণে বলে সকালের রোদ আসে। বাকি সব অন্ধকার, ঠাণ্ডা। সবাই বলে ওগুলো প্রাকৃতিক হিম-ঘর। সেখানে রাশি রাশি রসদ থাকে। মাছ, মাংস, ডিম, আলু, টিনের জিনিস। এখানে শীতের চোটে কোনো কিছু পচে না, পোকা-মাকড়-ও নেই। আমাকে লুকিয়ে কারো ঢুকবার জো নেই। তবে হ্যাঁ, এটা যেমন পুব দিকে, তেমনি পশ্চিম দিকেও এইরকম একটা ঘর আছে। সেটা এর তিনগুণ বড় আর দশগুণ ভালো। তাতে চাঁদ-সায়েব থাকে। দেখতে পারি না লোকটাকে। যদিও ও-ই একমাত্র বাঙ্গালী।

তবে আমার ঘর আর সায়েবের ঘরের মধ্যিখানে পাহাড়ের গা ঘেঁসে দশটা ঠাণ্ডা ঘর, সেখানে দিনরাত বিজলি-বাতি জ্বলে। তাহলে নাকি চোর আসে না। আমার ঘরের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকলে একটার পর একটা ঠাণ্ডা-ঘর পেরিয়ে, চাঁদ-সায়েবের ঘরের পাশ দিয়ে বেরুনো যায়। ঐ ঘরগুলোর সামনেই তিনদিক কাঁচে মোড়া প্রকাণ্ড খানা-কামরা। তার সব জানলা থেকে পাহাড় দেখা যায়। কি ভালো ঘর!

সায়েবের ঘরের ওপাশে একটা ঢাকা গলিমতো দিয়ে

প্রকাণ্ড রান্নাবাড়িতে যেতে হয়। চাঁদ-সায়েবকে সেখানকার সুলতান বলা চলে। দেখতে ঐ রোগা চিমড়ে, কিন্তু কি তার দাপট! ভয়ে সবাই থর-থর, সবাই বলে চাঁদ নাকি যুযুৎসু জানে, ইন্দ্রজাল জানে আর রাঁধে যা, সে একবার খেলে আর ভোলা যায় না। তবু একটু কেমন যেন। হয়তো দেখতে পারি না বলে অমন মনে হয়, কিন্তু এ আমি লিখে দিতে পারি যে বাইরে যতটা দেখায়, সেটাই ওর সব নয়। একটা ভালো কথা হল যে ওখান থেকে হাঁক দিলেও এখান থেকে শোনা যায় না। ওর শরীর যেমন লিক্-পিকে, গলার স্বরটাও তেমনি চিঁ-চিঁ! কিন্তু চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, গা দিয়ে বিজ্‌লি ছোটে।

মাঝে মাঝে আমাকে বলে নাকি আমাদের চার দিককার নিরেট পাহাড়গুলোর বেশির ভাগই ফোঁপরা আর তার ভিতরে যা আছে, যেদিন সে-সব বেরিয়ে পড়বে, আমাদের সকলের রাতের ঘুম, দিনের শান্তি বিদায় নেবে! শুনলে একবার কথা! পেটের মধ্যে গুড় গুড় করে!

পাৎলা একটা বিস্কুটে একটা ভাঙা চামচের হাতল দিয়ে এই পুরু করে মাখন লাগিয়ে, তার ওপর একটা বিলিতী জলপাই বসিয়ে, তাকিয়ে দেখতে পেলাম ন্যাড়া পাহাড়ের পেছনে ঘন সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়, তার পেছনে নীল পাহাড়, তারো পেছনে যেখানে নীল পাহাড় ফিকে হয়ে গেছে, সেখানে ঘন নীল আকাশের গায়ে আঁকা, এ-ধার থেকে ও ধার সমস্ত আকাশ জুড়ে রয়েছে সাদা বরফের পাহাড়। ন্যাড়া পাহাড়ের খাঁজে এখন আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। কে জানে, হয়তো ওখানে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। কেউ তার কথা জানে না। কিম্বা গরম জলের ঝরণা, কিন্তু তার ধোঁয়া ছাই রঙের হবে কেন? হয়তো পাহাড়ের গায়ে ফাটল আছে, তার ভিতর থেকে আগুনের হল্‌কা বেরোয়, তারি ধোঁয়া। কিন্তু—কুয়াসা মিলিয়ে গেছে, তবু এত বেলা অবধি আমাকে কেউ ডাকেনি কেন?

এক লাফ দিয়ে লোহার খাট থেকে নামতেই, খাটের ভাঙা স্প্রিং-গুলো ক্যাঁচ-কোঁচ করে উঠল, ঘরের কাঠের মেঝে খটমট করে দুলে উঠল আর তাকের ওপর সাজানো সারি সারি পুরনো ঝাড়বাতিগুলোর কাঁচের দোলক টুং-টাং করে এ-ওর গায়ে আছড়ে পড়ল। ঐ ঘরটা আসলে ওদের ঘর, ওদের পরিষ্কার রাখা আমার কাজ, তাই এ-ঘরটাতে থাকতে পেয়েছি। সবাই এ-ঘরটাকে বলে বাতি-ঘর; ভালো নাম না? একশো বছর আগে বাতিগুলোতে শত শত মোমবাতি জ্বালানো হত। প্রত্যেকটি বাতির একটা করে নাম আছে, কুইন, পার্ল, ঐ ডোমের নিচে দোলক ঝোলানোটার নাম 'ডাস্ক', চাঁদ সায়েব বলেছে তার মানে 'সন্ধ্যা'; কি ভালো না? প্রত্যেকটা বাতির তলায় ছোট্ট করে নাম লেখা আছে। একেকটার নাকি হাজার হাজার টাকা দাম। মালিক বড় লোক হলে, ওগুলোতে বিজলি তার জুড়ে আবার নাকি জ্বালানো হবে। ততদিন ওগুলো পরিষ্কার করে রাখতে হবে।—

হুড়মুড় করে দরজা খুলে আমার বন্ধু চাং এসে ঢুকল, হলদে মুখ সাদা, খুদে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে, চুলগুলো সজারুর কাঁটা। চাং বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে। চাঁদ-সায়েবকে পাওয়া যাচ্ছে না! ওর ঘর

দোর তচ্‌নচ, খাটের গদী কুচি-কুচি আর—আর—আর'—চাং ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল!

আমি ছুটে গিয়ে ওর ঘাড় ধরে বেদম এক ঝাঁকি দিয়ে বললাম, 'আর—আর কি? চাঁদ-সায়েবের মুণ্ডু কাটা, এই তো?' চাং মাথা নেড়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'না, তার চেয়েও ঢের খারাপ!! ভাঁড়ারের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না! ব্রেক্‌ফাস্ট দেওয়া যাচ্ছে না, বোর্ডাররা এমনি রেগে গেছে যে ওপরে যাওয়া যাচ্ছে না!!'

আমি উঠেই পড়েছিলাম, ওর কথা শুনে ধপ করে আবার বসে পড়ে বললাম, 'খাওয়া হয়ে গেলে আমি বাসন তুলি। খাবার দেওয়ার সঙ্গে আমার কি?'

২রা এপ্রিল ১৯৭৭—কাল আর কিছু লিখবার সময় পাইনি। সারা দিনটা যা ঝামেলার মধ্যে কেটেছে। আমি বসে পড়তেই, চাং আমার পা জড়িয়ে ধরল, 'মা কৈলুনের দিব্যি, আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব। তুমি শুধু তোমার সেই ইয়েটা দিয়ে ঠাণ্ডা-ঘরে ঢোকার এদিকের দরজাটা খুলে দাও।' শেষটা তাই দিলাম। মা কৈলুনের নাম করলে আমি আর কোনো কিছুতে 'না' বলতে পারি না। চাংএর, গলার থলিতে ঝোলানো থাকে, এই আমার কড়ে আঙুলটার মতো বড়, সবুজ জেডের তৈরি, ছিপছিপে এক মূর্তি, বুকের ওপর হাত জোড় করা, চোখ দুটো নামানো, দেখেই মনে হয় মনের কথা সব টের পাচ্ছে। তাই দিলাম খুলে গা-তালাটা। পৃথিবীতে এমন তালা নেই যা আমি খুলতে পারি না।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম সব শুন্‌শান্‌, কেউ কোথাও নেই, তক্‌তকে ঝকঝকে, এত সাফ যে একটা চুল পড়ে থাকলে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। চাং কোন দিকে না তাকিয়ে বগলের প্লাস্টিকের ঝুড়িতে, রুটি, মাখন, ডিম, জ্যাম, টিনের মাংস, দুধের গুঁড়ো ইত্যাদি নিয়ে, তড়িঘড়ি রান্নাবাড়ির দিকে চলে গেল। রাঁধুনেরা সব অপেক্ষা করছিল, জিনিস পেয়েই যে যার কাজে লেগে গেল। ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আমার দেখা হবে না। সকালের খাবার দেওয়া হয় দোতালার পুবের ঘরে, সেটার নাম মর্নিং-রুম। সব সায়েবী ব্যাপার এখানে, এককালে এই বাড়িতে বড় লাটের সব চাইতে মান্য-গণ্য অতিথিরা থাকত। এখানে কালো লোকদের ঢোকা বারণ ছিল। বাবুর্চি, বেয়ারা, জমাদার, সব সায়েব। টাই বেঁধে সবাই কাজ করত। ছুটিতে বিলেতে যেত। তাদের ব্যবহার-করা নানা রকম অদ্ভুত জিনিস, এখনো ছাদের ওপর চিল-কোঠার ঘরে জমানো আছে।

আমার এই ডাইরি আমি ছাড়া কেউ পড়বে না জানি, তাই বলতে আপত্তি নেই—সেই ইয়েটা দিয়ে এক কিলো ওজনের তালা খুলে চিলকোটায় ঢুকে দেখেছি। কিছু নিইনি, সেটা বলাই বাহুল্য। এখানে সকলে আমাকে বিশ্বাস করে, আমার সদাই ভয় ভুলে যদি কোনো দিন কোনো অন্যায় কাজ করে ফেলি! সে যাক্‌ গে। আমার হাতে এক ঘণ্টা সময় ছিল, গেলাম চাঁদ-সাহেবের ঘর দেখতে। তখনো বড় ম্যানেজার খবর পায়নি। কে দেবে খবর? বেজায় রাগী, বেলা দশটায় বিছানা ছেড়ে ওঠে, আলাদা বাংলোতে থাকে, হোটেলে আসে বেলা এগারোটায়। নাকি সত্যি সত্যি ইংরেজ, মণ্টেগু নাম—কি বিশ্রী শুনতে, না?—মিলিটারি সায়েব, সব সময় চটেই আছে। সকলে ওকে ভয় পায়, কেউ কোনো কাজের কথা জানতে যায় না।

তবে ছোট সাহেবের আলাদা ব্যাপার। তার নাম পিন্টো সেও নাকি সায়েব, কোথাকার তা জানি না, আমার চেয়েও কালো। কিন্তু খুব ভালো, যেমনি কাজের তেমনি দয়ালু। বড় ম্যানেজারের চেয়েও ও-ই নাকি বেশি পয়সা কামায়, অন্ততঃ চাং তাই বলে। গোয়াতে মায়ের কাছে হপ্তায় হপ্তায় রেজিস্টার চিঠি পাঠায়। তা করুক আমাকে কোনো কাজ করতে দিলে, সর্বদা বখশিস্‌ দেয়। চাঁদ সাহেবের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই, পিন্টোর সঙ্গে মুখোমুখি। সামলে নিয়ে বললাম, 'সায়েবের কাছে অর্ডার নিতে এসেছি।' পিন্টো কাষ্ঠ হেসে বলল, 'চাঁদ সাহেবের অর্ডার দেওয়া ঘুচল কিনা জানি না। হয় সে গেছে, নয় তাকে ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো বেঁচেও নেই। তখনি বড়-সায়েবকে

বলেছিলাম ঐ-সব ক্যালকাটা ফেলো এনো না, আমার চালাক-চতুর ভাইপোটা বসে আছে। আলি বাবুর্চির কাছে দুদিনেই কাজ শিখে নেবে। তা কে কার কথা শোনে! আর হ্যাঁ, দেখ, তুমি আবার এসব কথা গিয়ে লাগিও না। চাঁদ কাজ কামাই করছে, তুমি বরং তাজা মাছ তরকারির মার্কেটিংটা করে আনো। বোমা ঠেলাগাড়ি নিয়ে সঙ্গে যাবে।

তার মানে ঘণ্টা দুইয়ের মতো আমাকে সরিয়ে দিল। একটা দেড় ফুট লম্বা ফর্দ দিয়ে দিল, টাকাকড়ি দিল না, হোটেলের জিনিস সব সই দিয়ে আসে, মাস-কাবারে শোধ হয়। হাজার হাজার টাকার জিনিস। কেউ যদি বড়লোক হতে চায়, তার সিম্‌লে গিয়ে একটা ভালো হোটেল খোলা উচিত। ইংরেজরা নেই বটে, কিন্তু এই হোটেলটার আগা-পাশ-তলা টুরিস্ট আর কালো সায়েবে ঠাসা আর তারা ইংরেজদের মতো অত খিটখিটেও নয়। হবে কি করে, এরা জানেই না কোন জিনিস কেমন ধারা হওয়া উচিত! তাছাড়া সব টাকার রঙ এক। আলি বাবুর্চি অবিশ্যি বলে ইংরেজ সায়েবরা ঢের বেশি টাকাকড়ি ছড়াত। এখনো যে কোনো ইংরেজ সায়েব আসে না, তা নয়। এলেই পিন্টো তাদের ভাগাবার চেষ্টা করে, আগাম পয়সা চায়, চার-তলার খাবার ঘর দেয়। এরা নাকি হিপি, ভারি নোংরা। তবে আমার খুব মন্দ লাগে না দেখতে।

দু ঘণ্টা পরে হোটেলে ফিরে দেখি পিন্টো ইতিমধ্যে চাঁদ-সায়েবের ঘর গুছিয়ে সাফ করে, নতুন গদী বালিশ চাদর পেতে সাজিয়ে ফেলেছে। ওদের জিনিসপত্র কখনো এত গুছোনো অবস্থায় দেখিনি। অবাক হয়ে পিন্টোকে বললাম 'বাজার এনেছি। পুলিসে খবর দেবেন?'

পিন্টো আকাশ থেকে পড়ল। 'পুলিশ! এর মধ্যে আবার পুলিশ কেন? চাঁদ ফ্রেঞ্চ-লীভ নিয়েছে, তাই বলে পুলিশ ডাকার দরকার? কি বল? ভাইপোকে ডেকেছি সেই কি যথেষ্ট নয়? কি? ফ্রেঞ্চ-লীভ মানে জান? বিনা অনুমতিতে ছুটি। যাও কাজে যাও।'

চাং দেখলাম আমার উপর বিরক্ত। সারা সকাল নিজের কাজের ওপর আমার কাজ-ও করতে হয়েছে তো। আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। আমি আমার বাতি ঘরে গিয়ে, দরজাটা টেনে দিয়ে ঝাড়-লণ্ঠনগুলো সাফ করতে লেগে গেলাম। রোজ করতে হয়। তাতে আমি একটুও বিরক্ত নই। সব বাতি আলাদা রকম। তার মধ্যে কয়েকটা পুরুষও আছে। ঐ চারফুট লম্বা যেটা ছাদ থেকে মোটা শেকল দিয়ে ঝোলানো, ওর নাম ন্যাবব। ন্যাবব হল নবাব। যেমনি নাম তেমনি চেহারা। আগা-গোড়া ফটিকের তৈরি, সাদা লাল, হলুদ আর কেমন একটা রঙ, সে নীলও নয়, সবুজও নয়; তার দিকে একটুক্ষণ তাকালে মনে হয় বুঝি একটা কুয়োর মধ্যে তাকিয়ে আছি, সে কুয়োর তল নেই। আঙুলের ছোঁয়া লাগলে ন্যাবব বেজে ওঠে, একেক সারি দোলকের একেক রকম সুর! কখনো যদি যথেষ্ট টাকা জোগাড় করতে পারি ঐ ন্যাববকে আমি কিনে নেব। এখন তো বলতে গেলে এরা সবাই একরকম আমারি জিনিস। আর কেউ ওদের গায়ে হাত দেয় না। আমার ঘরে না এলে ওদের কেউ দেখতেও পায় না। কিন্তু যে-ই আমার বাতি-ঘরে আসে, সেই বাতি দেখে চমকে যায়। সেটা আমার পছন্দ নয়। তাই গদীর খানিকটা কাপড় এনেছি। ঘরের ঐ ধারটা পরদা দিয়ে আড়াল করে দেব।

দুপুরে খাবার সময় সকলের বড্ড বেশি কাজ থাকে, কাজেই কোন কথা হয় না। চাঁদ সাহেব নিখোঁজ হয়ে গেছেন বলে হোটেলের কর্তৃপক্ষের এতটুকু মাথা-ব্যথা দেখলাম না। চাং বলল এরকম নাকি প্রায়ই হয়, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আর কোনো কাজকম্ম করা যাবে না। মুখে বললেও একটু খট্‌কা ওর নিশ্চয়ই লেগেছিল, কারণ লাঞ্চ সেরে, ঘরে একটু বসেছি, এমন সময় আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে আমার হাতে একটা টেলিগ্রাম ফর্ম দিল। চাঁদ-সায়েবের হাতে লেখা 'প্রবলেম। কম শার্প ছোটমামা।' চাং বলল, 'ছোট সায়েব ফেলে দিয়েছিল। চাও নাকি?' বললাম 'টেবিলে রেখে যাও। হাজার হক আমিও বেঙ্গলি।'

ক্রমশঃ

দুই পাগল

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

আমাদের দক্ষিণ কলকাতার বাড়ি থেকে মোটরগাড়ি করে ব্যারাকপুর বিমানঘাঁটিতে যেতে যত সময় লাগত, তার চেয়ে কম সময়ে পৌঁছে যেতাম সেখান থেকে ধলভূম গড়ে। সেখানে এক শালবনের মধ্যে যুদ্ধের সময় তৈরি একটা শান বাঁধানো চত্বরে অনায়াসে নেমে পড়ত আমাদের কোম্পানির ছোট্ট বিমান 'অস্টার' অথবা 'বনাঞ্জা। আমার ছিল খনি আকর দেখে বেড়াবার কাজ। স্থানীয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ম্যানেজার তার ল্যাণ্ডরোভার গাড়িতে তুলে নিয়ে মোহনপুর, মহুলাসোলী ও ঘাটশিলার কাজের জায়গাগুলি দেখিয়ে আবার বিমানের কাছে পৌঁছে দিত। একই দিনে সূর্যের আলো থাকতে থাকতে আমি সুবর্ণরেখা নদী ডিঙিয়ে সাহেবঝারা, বুরহাইরানা, গরুমহিষানী, ঠাকুরানী প্রভৃতি গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় পর্বতের ওপর দিয়ে উড়ে সিংভূম-কেওঞ্জরের কিনারা বরাবর এক জায়গায় নেমে পড়তাম।

ছোট বিমান এত কাছ দিয়ে উড়ত যে গাছপালা, পাথর ও নদীনালার রঙ ও রেখার বৈচিত্র্য ভাল করে চোখে পড়ত।

একবার উত্তর উড়িষ্যার লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের খনির কাজ সেরে এই পথেই ঘাটশিলায় ফিরে আসি। সেখানে লোকালয়ের উপকণ্ঠে হরিণডুকৃড়ী অঞ্চলে কোম্পানীর ভাড়া করা এক বাংলো বাড়িতে আমার জন্যে একটা ঘর সংরক্ষিত থাকত।

সুষনি-কলমি মিষ্টি নাম ছিল সে বাড়ির। খুব নির্জন। পশ্চিমের বারান্দায় বসে তন্ময় হয়ে দেখতাম সুবর্ণরেখা নদী ও তার ওপারের পর্বতপুঞ্জ অস্তগামী সূর্যের রক্তিম পটের ওপর যেন আঁকা।

সেদিন কিন্তু তাড়া ছিল। খবর পেয়েছিলাম খেণ্ডাডি পাহাড়ে টাটা কোম্পানী যেখানে সিলিকা পাথরের ইজারা নিয়েছে তার আর একপ্রান্তে কায়নাইট পাথর আছে। যে লোক আমাকে নমুনা দেখিয়েছিল তাকে কোন আগ্রহ দেখাইনি। তাহলে প্রতিযোগীদের কাছে গিয়ে খবরের দর বাড়াবার চেষ্টা করত। সঙ্গে আনলে হয়ত ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু আমি ভাবলাম মোটামুটি যেটুকু ইঙ্গিত পেয়েছি তার ওপর নির্ভর করে একবার পাহাড়ে উঠে পরিক্রমণ করে নিলেই বোঝা যাবে। সময় সময় পাঁচ-দশ-টাকা বকশিসের লোভে অনেকে আমাদেরই খাদান থেকে দু'চার টুকরা পাথর তুলে এনে আবিষ্কারের দাবি করত।

যাই হোক, আমি স্থানীয় ম্যানেজারের কাছে

ব্যাপারটা গোপন রেখে তার গাড়িটা চেয়ে নিয়ে মুসাবনী ক্লাবে যাচ্ছি বলে রওনা হলাম। চা খেয়ে বার হতে সাড়ে চারটে বেজে গেলেও প্রচুর সময় ছিল হাতে। তখন বসন্ত কাল, দিন বড় হতে শুরু হয়েছে। নদী পার হয়ে মুসাবনীতে একজন বন্ধুর বাড়িতে মুখ দেখিয়ে গেলাম। সেটা ছিল তামা কোম্পানীর মাইনিং ক্যাম্প।

সেখান থেকে খেণ্ডাডি পাহাড় বেশি দূর নয়। একদিকে এক শীর্ণকায়া শাখানদী ও আর একদিকে উদ্ভিদাকীর্ণ পাহাড়তলে টাটা কোম্পানির সিলিকা খনির ক্যাম্প। আমাকে রাখা মাইন্স ধ্বংসবিশেষের কাছে গাছতলায় একটা নিভৃত জায়গায় গাড়ি রেখে পাহাড়ে উঠতে হল। দিনের আলো থাকতেই ফিরব বলে সঙ্গে টর্চ নিইনি তবে একটা হাতুড়ি সব সময় সঙ্গে থাকত। সেইটা আর একটা নমুনা সংগ্রহের থলি হাতে ছিল।

তখনও তেজস্ক্রিয় য়ুরেনিয়াম পদার্থের জন্যে তল্লাশ শুরু হয়নি কাজেই সে পথে গাড়ির যাতায়াত ছিল কম।

গাছগুলোর বেশির ভাগ হচ্ছে শাল। তাছাড়া অন্য নানা ধরনের গাছও আছে। তখন বনে বনে রঙের সমারোহ কিন্তু আমার সবটা মনই পড়ে আছে পায়ের দিকে। পাথরের কোণ ভেঙে দেখে দেখে এগিয়ে যাচ্ছি ওপর দিকে। সময়ের খেয়াল নাই। কোয়ার্ট-জাইট পাথরের একটা পুরু স্তরবিন্যাস দেখে আশা হল এবার আসল জিনিস দেখতে পাব। দ্রুত এগিয়ে যাওয়া সহজ হল কারণ ততক্ষণে পাহাড়ের শিখরে উঠে গেছি।

একবার রোখ চেপে গেলে আর থামতে পারি না। গাছের ফাঁকে ভিন্ন ধরনের পাথরের চাঙর দেখে আবার কোনা ভাঙতে লেগে গেলাম তারপর হঠাৎ একবার মাথা তুলে দেখি চাঁদ উঠেছে।

চমক ভাঙতে হুঁশ হল যেখানে গাড়ি রেখেছি সেখান থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি আর সেদিকের গাছপালা এত ঘনবদ্ধ যে চাঁদের আলো পাওয়া যাবে না। এদিক থেকে নেমে যাওয়া সহজ হলেও কোথায় গিয়ে রাস্তা পাবো তার কোন ঠিক নাই। তাছাড়া ঢালু এত বেশি যে ভারি থলে নিয়ে নামা মুশকিল হতে পারে।

ততক্ষণে চাঁদ আরও খানিকটা উঁচুতে উঠেছে আর নদীর উপত্যকা দেখাচ্ছে অনির্বচনীয় সুন্দর। এতক্ষণ ক্রমান্বয়ে ঝুঁকে পড়ে পাথর ভেঙে ভেঙে ঘাড়ে ও কোমরে ব্যথা হয়ে গেছিল। একটি বড় গাছের গুঁড়ির ওপর পিঠ দিয়ে বসে পড়লাম।

কোন বাতাস ছিল না সেই সন্ধ্যার সময়। প্রকৃতিকে এতখানি নিথর নিঝুম দেখিনি কোন দিন।

একটা শব্দ শুনে উঠে দাঁড়ালাম। ভয় হল ভাল্লুক মহুয়া খেতে এসেছে। কিছুক্ষণ এক তীব্র মিষ্টি গন্ধ আসছিল নাকে। দেখতে পেলাম না। শব্দ শুনে মনে হল মস্ত একটা ভাল্লুক পাশ দিয়ে নেমে গেল। আর দ্বিধা না করে আমি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যেদিক থেকে এসেছি সেই দিকে এগিয়ে চললাম। বহুবার হোঁচট খেয়ে, কাঁটার আঁচড়ে জর্জরিত হয়ে, হাতে আঘাত পেয়ে পা মচকে যেটুকু চাঁদের আলো পাই তার সাহায্যে ঘণ্টা দুই পরে প্রথম দিকের ভাঙা পাথর দেখতে পাই। তারপর গাড়ি খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি।

পরের দিন ভাঙা পাথরের টুকরোগুলো পরীক্ষা করে দেখছি এমন সময় "পথের পাঁচালী" প্রণেতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প করতে এলেন।

তিনি একসময় কোন পারিবারিক দুর্ঘটনার পরে আফ্রিকার গহন বনে গিয়ে বাস করবেন বলে আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি বলি এত দূরে যাবার আগে দেশের মধ্যে অরণ্যবাস করে দেখলে কেমন হয়। প্রথমে সিংভূম-কেওঞ্ঝরের জঙ্গলের কথা বলে তারপর সুবর্ণরেখা নদী ও জলমাও-ধানজোরি পাহাড়পুঞ্জের বর্ণনা দিই।

আমি তাঁকে বলি যে ধলভূমে এখন যে জঙ্গল পাবেন তার মধ্যে আদিম অরণ্যের সে সৌষ্ঠব, সে মাধুরী, সে ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যের কিছুই অবশিষ্ট নেই। সাবেক বনস্পতি আর চোখে পড়বে না। এখন যে গাছ গাছড়াগুলো বন্ধুর পাষাণময় এলাকাগুলি আঁকড়ে আছে

সেগুলো পুষ্টির অভাবে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ।

আরও বলি এই দুরবস্থা কেমন করে হয় তার হদিস পাওয়া যাবে ধলভূম রাজ এস্টেটের প্রধান পরিচালক বঙ্কিম চক্রবর্তীর কাছে।

বিভূতিবাবু যখন বঙ্কিম চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ করেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। কে যেন বলেছিল তিনি প্রথম ঘাটশিলায় যান বর্ষার শেষে। আমি সে সময় উড়ে যাবার সময় দেখতে পেতাম পাইকারী হারে গাছ কাটার ফলে জল, বাতাস ও তাপের যুক্ত আক্রমণে পাথর ফেটে গুঁড়িয়ে ছোট বড় নদীর জল গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে চলেছে, যখন ট্রেনে পেতাম তখন চোখে পড়ত বনফুলের রূপ মাধুর্য, নানা রঙের পাথরের আনাচে কানাচে ছোট ছোট ঝর্ণা, সূর্যের আলো চূর্ণ হয়ে প্রতিফলিত হত খণ্ড খণ্ড অভ্রের টুকরো, তুষার-ধবল কোয়ার্টস ও আর হরেক রকম রঙের পাথর থেকে।

বিভূতিভূষণ ছিলেন সৌন্দর্যের উপাসক। তাঁর চোখে নিশ্চয় আরও অনেক কিছু ধরা পড়েছিল। দেখতে পেলাম গহন বনের সন্ধান না মিললেও প্রথম দর্শনেই ঘাটশিলাকে ভালবেসে ফেললেন তিনি।

আমি এসেছি খবর পেলে মাঝে মাঝে চলে আসতেন। সেরেণ্ডার গহন বন দেখবার জন্যে আর আমার সাহায্য দরকার হয়নি। তিনি সিংভূমের ফরেস্ট অফিসারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে যখন ইচ্ছে ঘুরে আসতেন সেই সব অরণ্যে।

সেদিন তাঁকে একটু বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পশ্চিমের পর্বতপুঞ্জের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'ঐসব পাহাড়ে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি অজস্র ছিল—এদিকে একটা জায়গার নামই হচ্ছে 'হাতি টিপা'—বঙ্কিমবাবু বলেন পাইকারি হারে জঙ্গল কাটার পর থেকে তারা সব ময়ূরভঞ্জের দিকে চলে গেছে—'

আমি বললাম, 'ভাল্লুক আছে আমি জানি, নেকড়েও আসে শুনেছি—তা সত্বেও শুনতে পাই আপনি একা একা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান—'

বিভূতিবাবু বললেন, 'বড় ভাল লাগে, বিশেষ করে শরত কালে, কিন্তু কোনদিন বাঘ ভাল্লুক দেখিনি।'

আমি বলি, 'পাথর দেখবার তালে থাকলে অন্য সব কিছুর প্রতি আমার মনের দরজা বন্ধ থাকে আর আপনি যখন যান তখন গাছপালা ফল ফুল দেখতে এত মশগুল থাকেন যে কোনদিন নির্ঘাত ভাল্লুকের আঁচড়ে প্রাণটা খোয়াবেন—এই ত কাল সন্ধ্যার পরে খেণ্ডাডি পাহাড়ে উঠে পথ হারিয়ে যাই—তারপর হঠাৎ দেখি গাড়া নালা আর গালুডির দিক থেকে চাঁদ উঠছে। ভাবছিলাম সেই অপূর্ব দৃশ্য একমাত্র আপনার লেখনীতে ধরা থাকতে পারতো।'

বিভূতিবাবু সটাং উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গাছতলায় তবে কি আপনি ছিলেন?—শুনেছিলাম সেখানে হান্টার সাহেব-এর প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়—আচম্‌কা চাঁদের আলোতে প্যান্ট পরা লম্বা চেহারা দেখে আমি ধড়-মড়িয়ে পড়ি কি মরি করে নেমে আসি—'

এবার আমার বিস্ময় প্রকাশের পালা। বললাম, 'আমি কিছু দেখতে পাইনি কিন্তু শব্দ শুনে ভাবি ভাল্লুক!!'

লাস্টম্যান

অজয় হোম

লাস্টম্যান!!

মাঠে ঢুকছে। ফিল্ডাররা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণ ধরে খাটাখাটুনি এবার শেষ হবে। ওঃ! দশ নম্বরী ব্যাট যা না একটা মারকুটে ছিল। সারা মাঠটাকে কিভাবে না চষিয়েছে। গরমে রোদে শীতের দিনেও গলদঘর্ম। এখন যেন একটু আরাম লাগছে। হয় এক বল না হয় আর কটা বলের মধ্যেই প্রতিপক্ষের ইনিংস হবে শেষ। এবার দম ফেলতে পারব।

লাস্টম্যান সাধারণত বোলারই হয়ে থাকে আর দলের মধ্যে যে ব্যাটিংএ সবচেয়ে খারাপ সেই শেষে আসে। তারপর সে যখন বেগ দিতে থাকে, তখনই হয় মুশকিল। সব ফিল্ডারদের মাথা গরম হয়ে ওঠে। ওভার থ্রো হয়, অতিরিক্ত সচেতনতার ফলে ক্যাচ পড়ে, পায়ের তলা দিয়ে বল গলে। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার।

মনে মনে এবার একবার উলোটপুরান কল্পনা কর। ধরে নাও, টেস্টম্যাচ হচ্ছে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের। এই টেস্টের ফলাফলের ওপর রাবার নির্ভর করছে। বেদি তো এখন অলরাউণ্ডার—সে খেলছে। প্রসন্ন আউট হয়ে গেল বেদি লাস্ট বলে রান নিতে পারল না। চন্দ্রশেখর মাঠে নামছে। ইংল্যণ্ড দলের সকলের সারা দেহে মুখে আনন্দের আভা। নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা মশকরা। বেদির সঙ্গেও। আর গোটা তিরিশেক রান করতে পারলেই ভারতের জয়। মাঠশুদ্ধ লোক এবং দু'দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই জানে—ভারতের কোন আশা নেই। সেই সময় দেখা গেল, চন্দ্রশেখর খুব আস্থার সঙ্গে ব্যাটে খেলে চলেছে। চারও মারল একটা নির্ভুলভাবে। দুই ফিলডারের মাঝে বল ঠেলে রানও নিচ্ছে। এমনকি বেদির অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাস্ট বলে রান নিয়ে নিল—এত আস্থা। তিরিশ রানের ব্যবধান ক্রমে কমে আসছে। প্রতিটি দর্শক, প্যাভিলিয়নের প্রতিটি লোক উত্তেজনায় ভরপুর। কাঁপছে। ইষ্টনাম জপছে। নিশ্বাস ফেলাও হয়ে উঠছে কষ্টকর।

গ্রেগসাহেব উইলিস-ওলড-লিভারদের দিয়ে বামপার-বাউনসার, মাথাভাঙা পাঁজরভাঙা বল যেমন দেওয়াচ্ছে—থেকে থেকে তেমনি স্পিনবোলার আনডারউডদেরও আনছে। নিজেও বল দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। চন্দ্রশেখর অবিচলিত। যেন পোড়খাওয়া ব্যাটস্‌ম্যান। বাম্‌পারের বিরুদ্ধে কখনও বলের লাইন থেকে সরে যাচ্ছে শেষমুহূর্তে, কখনওবা মাথা নিচু করছে, বসে পড়ছে। সোজা ব্যাটে নিখুঁত ফুট ওয়ার্কে প্রতিটি বল মোকাবিলা করে চলেছে। ইংল্যাণ্ডের গ্রেগের কালঘাম ছুটছে। তার চুল ইজ দি খাড়া। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। এভাবে শেষ জুটিতে—তাও আবার এক বলের খদ্দের চন্দ্রশেখরের হাতে ইংল্যাণ্ডের ভরাডুবি? রাবার হাতছাড়া? ভাবা যায়? সত্যি যদি এমন হত……!

আমরা তিন বন্ধু তখন থার্ড সেকেণ্ড ও ম্যাট্রিক

ক্লাসের ছাত্র। এখনকার ভাষায় ক্লাস এইট, নাইন ও টেন। খেলতাম শ্যামবাজার দেশবন্ধু পার্কের দক্ষিণ কোণায় একটা মাঠে। তখন আসল বিলেতের এম সি সি —মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব ভারত সফর করছে এ. আর গিলিগানের নেতৃত্বে। সুতরাং এম সি সি নামটা নিতে হবে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিল পমি, রমি আর গৌর। পমির খবর জানি না। রমি—সৌমেন মুখোপাধ্যায় পরে বড়ো ফিল্ম ডিরেকটর হয়েছিল। আর গৌরের ছেলে এখন কলকাতার মাঠে একজন বড়ো ক্রিকেট খেলোয়াড়। আর সঙ্গে ছিল কমল—কমল ভট্টাচার্য, যার মুখ থেকে তোমরা আকাশবাণীতে খেলার বেতারভাষ্য শুনে থাক। তাকে ডাকতাম 'ক্যামেল' বলে। তার দাদা ভজা—বিমলও ছিল। ছিল সুধীর চ্যাটার্জি, যে পরে হ্যাসেটের দলের বিরুদ্ধে ইডেনে খেলছে। এরকম আরো অনেক ছিল আমাদের ক্লাবে।

আমাদের একজন ফাস্ট বোলার ছিল। তাকে ডাকতাম 'লম্বু' বলে। ওই নামই ছিল চালু। খুব সম্ভব তার আসল নাম শৈলেন। ঠিক মনে পড়ছে না। সে কথা বলত কম কিন্তু বল করত বেশ জোরের ওপর। বল দুদিকেই হাওয়ায় বেঁকত। আমরা বলতাম, 'ওরে লম্বু, তোর বল বেশ 'সোয়ার্ভ' করছে রে। ঠিকমতো পিচ ফ্যাল। তখন 'সুইং' নাম জানতাম না। জানতাম না তার দুই শ্রেণীবিভাগ—ইন ও আউট; ওসব সেযুগে চালু ছিল না। এখন বুঝি লম্বু ন্যাচারাল সুইং বোলার ছিল।

বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, বাড়ির সামনে গলিতে সকাল থেকে টেনিস বলে চলত গলি-ক্রিকেট। ভাঙত বসবার ঘরের আলমারি, ছবির কাঁচ। কমলদের বাড়ির ভাত বা ডালের হাঁড়িতে গিয়ে বল পড়ত। পাড়ার কাকাবাবু যিনি সন্ধ্যেবেলায় নিজস্ব এবং বিকৃত সুরে তবলা সহযোগে পাড়া ফাটিয়ে গান গাইতেন, তাঁর অফিসে বেরোনোর সময়, আমরা টিপ করে ব্যাট দিয়ে খেলে গায়ে বল মারতাম। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছুটতাম ডিউস বলে ক্রিকেট খেলতে দেশবন্ধু পার্কে। আমাদের মতো ছোটো দলের সঙ্গে ম্যাচ খেলাও হতো। ধীরবিক্রমশ ওয়াই. এম. সি. এ.-তে থেকে পড়তো।

সেই বন্দোবস্ত করেছিল ওদের মাঠে, ওদের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার। ওয়াই. এম. সি. এ. বনাম এম. সি. সি.।

আমরা দশটার মধ্যে মাঠে গিয়ে হাজির। 'ক্যামেল' বা কমল বোধ হয় ক্যাপটেন ছিল। টসে হেরেছিলাম কি জিতেছিলাম মনে নেই। সাড়ে দশটায় খেলা শুরু হল। আমরা ফিল্ডিং করতে নামলাম। লাঞ্চের পরেও ওরা খেলে সবাই আউট হল, বোধ হয় ১৫৬ রানে। দু'একজন ফোর্সফুল বা মারকুটে ব্যাটধারী ছিল, খুব খাটাল। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে উঠবোস করেছি সমানে। লম্বু মোটেই বল করতে পারে নি। কোনক্রমে তিনটে উইকেট নিয়েছিল। কমলই নিয়েছিল বেশি। লম্বু পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়েছিল। পরীক্ষার দু'তিন দিন আগে ফিরেছিল। ও এর আগে ম্যাচ খেলে নি। এই প্রথম মাঠে নামছে। অনভ্যাসে বল ঠিকমতো করতে পারল না বলেই মনে হল। স্টাম্পের বাইরেই বল পড়ছিল বেশি। বল ধরতে বেশ বেগ পাচ্ছিলাম। বাইও হচ্ছিল।

আমাদের আটটা উইকেট পড়ে গেছে। বোর্ডে ১৪৪ রান। দু'ওভার বাকি। কোনক্রমে দু'ওভার কাটালেই খেলা ড্র। আমি আর ভানু খেলছি। ভানু বেশ খেলছিল। জেতার জন্যে বাকি তের রানের কথা চিন্তাই করছি না। হঠাৎ থার্ড বলে ভানুর অফ স্টাম্পের বেলটা উড়ে গেল এক অপ্রত্যাশিত ভালো বলে।

লাস্টম্যান লম্বু আসছে। আর কোনও আশা নেই। তিনটে কেন ও একটা বলও কোনও দিন আটকাতে পারে নি। ধীরবিক্রমের কাছে এরা শুনেছে, ও একদম ব্যাট করতে পারে না। কী উল্লাস ওদের। লম্বু ক্রিজের কাছে আসতে কাছে গিয়ে বললাম, 'লম্বু ভাই, আনাড়ির মতো আঁকড়াবার চেষ্টা করবি না। সোজা ব্যাটটা শুধু স্টাম্পের সামনে খাড়া রাখিস। বাইরের বল মারবার বা খোঁচা দেবার চেষ্টা করিস নে। পারবিনা ভাই তিনটে বল আটকাতে?'

ও ঘাড় নেড়ে বোকার মতো মৃদু হেসে, বলল,

'চ্যাষ্টা করুম'।

কোনও দিনই ওকে গার্ড নিতে দেখি নি। আগের লোকেরা যেখানে ব্যাট করে যাওয়ার জন্যে দাগ থাকে, সেখানে ব্যাট রেখে বলের জন্যে অপেক্ষা করে। বল এলেই ব্যাটটা ঘুরিয়ে দেয় আর তেকাঠি ফাঁক হয়ে যায়। সেই লম্বু গম্ভীর হয়ে আম্পায়ারকে বলল, 'ওয়ান লেগ।' অর্থাৎ লেগ স্টাম্প গার্ড দাও। আমি হতভম্ব! সব ফিলডাররা ওকে ঘিরে ধরেছে। বোলার দৌড়ে এসে বল ছাড়ল। লেগ-মিডের ওপর বল। লম্বু একটু এগিয়ে হাফভলি করে নিয়ে ব্যাট শূন্যে তুলতেই আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। এখুনি কানে আসবে তেকাঠিতে বল লাগার অবিস্মরণীয় আওয়াজ। কানে এল ব্যাটে-বলে সম্পর্কের আওয়াজ। চোখ খুলে গেল আপনা থেকেই। আমার মাথার উপর দিয়ে বল উড়ে চলেছে। মাঠ পার! ছক্কা!!

—'এই লম্বু কি হচ্ছে? একটা আন্দাজে লেগে গেছে। আর দুটো বল কোনোরকমে আটকা। বাকি ওভারটা আমি সামলে দেব। ইয়ারকির সময় নয়। আটকা ভাই। প্লিজ হাঁকড়াস না।'

ওর এক জবাব—'চ্যাষটা করুম।...'

অফস্টাম্পের ওপর বল। দেখছি বলের লাইনে লম্বু বাঁ-পা বাড়িয়েছে। ব্যাটটা তুলেছে লেগস্টাম্পের ওপর। বাঁ হাতের কনুই ভেঙে বলের দিকে, কোমরটা একটু বেঁকিয়ে ব্যাটটা নিয়ে এল বাঁ-পায়ের গোড়ায়, যেখানে বলের সঙ্গে ব্যাটের সম্পর্ক হল। ব্যাট কাঁধের ওপর ফিনিশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একস্ট্রা কভার দিয়ে গোলার মতো বল ছুটে গেল মাঠের বাইরে। এত ভালো কভার ড্রাইভ আমরা কেউই কোনোদিন মারি নি। শুধু দেখেছি সাহেব সুবোদের মারতে।...এত আন্দাজ নয়? লম্বু কোথায় শিখল এ মার? কারুর মুখে কথা সরছে না। মাঠশুদ্ধ লোক হতবাক। নিশ্চুপ। লম্বু মারছে কভার ড্রাইভ! অচিন্তনীয়!...বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। শেষ বল। অফস্টাম্পের একটু বাইরে। ফোর্থ কি ফিফথ্ স্টাম্প হবে। ডানপা

বলের লাইনে বাড়িয়ে যা একটি কাট মারল কাঁধ আর ফোরআর্মের জোরে তা ভাবাই যায় না। ম্যাচ জিত। উল্লাসে আমরা সবাই লম্বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

ফেরার সময় ট্রামে লম্বুকে পাশে বসিয়ে এই খেলার রহস্য জিজ্ঞেস করলাম। প্রথমে বলতেই চায় না, লজ্জা পায়। অনেক কষ্টে পরে বলে এবার ছুটিতে ওর ছোটকার বন্ধু বাংলার স্বনামধন্য হেমাঙ্গ বসু ওকে শিখিয়েছেন। বলেছিলেন তোমার এমন শরীর, বল কর এত ভালো আর ব্যাট করতে পার না? ছিঃ! প্রতিদিন অত্যন্ত ধৈর্য ধরে শিখিয়েছেন। বাড়িতে আয়নার সামনে ব্যাট নিয়ে কীভাবে শ্যাডো-প্র্যাকটিস করতে হয়—তাও

দেখিয়েছেন। সে রোজ বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাই করে। আর কলকাতায় বাড়ির পাশে শিবশঙ্কর মিত্র লেনে যে জমিটা খালি আছে, সেখানে ছোটভাইকে দিয়ে রোজ বল করায় আর মার প্র্যাকটিস করে। বল করার অভ্যাসটা কমে যাওয়ার জন্যে বল আজ পড়ে নি। জীবনে এমন লাস্ট্‌ম্যানের আর সাক্ষাৎ পাই নি।

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

দুরন্ত এক ঘুরন্ত ছেলের গপ্‌পো

জীবন সর্দার

রাস্তার নাম 'য' ফলা। সেটি ধরে পুবে গিয়ে বসুরায়দের বাড়ি নীলাঞ্জনের দেখা পেলাম। আমি যেতেই বললে, 'হলুদ চড়ুইয়ের দেখা এখনো পাইনি! ততক্ষণ এই নকশাখানা তুমি দেখতে পার'।

নীলাঞ্জন বলে সে প্রকৃতি-পড়ুয়া। মাঠে বনে ঘুরে ঘুরে সে প্রকৃতির রূপগুণের কারণ খোঁজে। তাই কেউ তাকে বলে ঘুরন্ত ছেলে, কেউ বলে দুরন্ত। ঘর থেকে বাইরে এসে, ছুটিতে বা অবসরে কি দেখে সে সময় কাটায় একটি ছবি এঁকে আমার হাতে দিল।

প্রকৃতি তো শুধু মানুষ নিয়েই নয়। রোদ হাওয়া জল মাটি গাছ আর সব জীবদের নিয়েই তো প্রকৃতি। চারপাশে তারা আর মাঝখানে প্রকৃতি-পড়ুয়া। যাকে খুঁজে বার করতে হবে প্রকৃতির রূপ-গুণ আর কার্য-কারণের রহস্য। তার জন্য চাই:

চোখ কান হাত মাথা:
আর চাই দুটো খাতা।

একটা খাতা বাইরে নিয়ে লেখা, যার নাম 'মেঠো খসড়া।' অন্যটিতে প্রতিদিনের দেখা বিষয় লেখা—মানে দিনলিপি যা কিছু দেখবে লিখবে, সব জানিয়ে দেবে প্রকৃতি-পড়ুয়ার দপ্তরে।

নীলাঞ্জনের কথা শুনে আমি তার পাশে হলুদ চড়ুই দেখার আশায় বসে রইলাম।

প্রকৃতি-পড়ুয়ার পাঠশালা প্রতি মাসের প্রথম রোববার সন্দেশ কার্যালয়ে বিকেল চারটে থেকে ছটা।

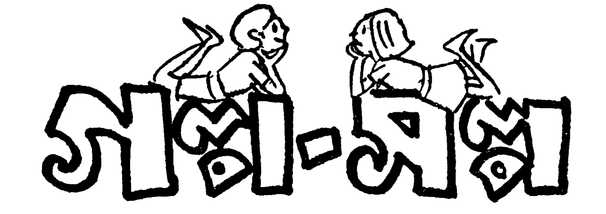

লীলা মজুমদার

যেই না শান্তিনিকেতনে শীত শেষ হয়ে যায়, অমনি শির-শির সর সর করে দখ্‌নে বাতাস বইতে থাকে আর গাছে যত শুকনো পাতা বাকি ছিল, সব ঝরে মাটিতে পড়ে। পড়েই আবার ঘূর্নি হাওয়ায় ঘুরতে থাকে, দেখে মনে হয় অদৃশ্য ডাইনীবুড়ি বুঝি লম্বা ঝাড়ু দিয়ে ঝরা পাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ন্যাড়া গাছের খুদে খুদে পাতার কুঁড়ি রাতারাতি খুলে যায়, কোনোটার কচি কলাপাতার রঙ, কোনোটা বা লালচে। জারুলফুলের নতুন পাতা কেমন নরম গোলাপী। আমগাছেও যেই না কচি পাতা দেখা যায়, অমনি বোঝা যায় বোল ধরার সময় গেছে। দুরন্ত বাতাসে বাতাবিলেবুর ফুলের পাপড়ি ঝরে, মনে হয় গাছতলায় কে নরম সাদা গালচে পেতেছে। চারদিক সুগন্ধে ভুর ভুর করে।

দলে দলে হাঁসরা উত্তর দিকে উড়ে যায়। মাঝে মাঝে এত নিচ দিয়ে যায় যে তাদের ডানার শোঁ-শোঁ শব্দ কানে আসে। পাখির ঝাঁক দেখে সবাই বলে, শীত ফুরুল, বসন্ত এল। আর কিছুদিন বাদেই কাল-বোশেখীর ঝড় উঠবে, উত্তর পশ্চিমের জানলা-দরজার হুড়কো কপাট ঠিক আছে তো?

কোথাও-বাধা-বন্ধ-নেই শান্তিনিকেতনে ঝড়ের দাপট বড় বেশি। উপাচার্য মশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে একটা সত্যি গল্প শুনলাম। ওদের বাড়িতে এক আম গাছ; সেটি প্রায় দোতলার সমান উঁচু। দোতলার জানলা থেকে গাছের ডালপালার ভিতরটা দেখা যায়। নিচে থেকে যেমন গাছটাকে শান্ত-শিষ্ট মনে হয়, আসলে মোটেই তা নয়। গাছের মধ্যে ছোটখাটো একটা পাড়া আছে। পাড়ায় দুটি দল আছে, তাদের মধ্যে ভাবসাব নেই।

একদল কাক গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে, গুঁড়ির গা ঘেঁষে কাঠকুটো দিয়ে বাসা করে থাকে। কাকের বাসার না আছে যত্ন, না আছে ছিরি। তবু তারা তারি মধ্যে ডিম পাড়ে, নিজেদের বাচ্চাও তোলে, কোকিলের বাচ্চাও তোলে। আর শালিকরা বাসা করেছে খানিকটা দূরে, ডালের আগার দিকে। তাদের বাসাগুলো অনেক বেশি পরিপাটি কিন্তু ততটা নিরাপদ নয়।

গত বছর একদিন বিকেলে ঝড় উঠল। মনে হতে লাগল হাওয়ায় তৈরি কোনো দৈত্য এসে বড় বড় গাছের ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে! দোতলার জানলা দিয়ে মেয়েরা দেখল আমগাছের ডালের আগায় একটা শালিকের বাসা হাওয়ায় বড্ড বেশি দুলছে। বাসায় চারটি ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা। তাদের গায়ে রোঁয়া বেরিয়েছে, পালক গজায়নি, চোখ ফুটেছে কিনা সন্দেহ। তাদের নিয়েই পাখির বাসা দোল খাচ্ছে। মা-পাখি বাবা-পাখি বোধ হয় খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। তাদের দেখা যাচ্ছিল না।

দোল খেতে খেতে সকলে যা ভয় করেছিল, তাই হল। বাসাটা নিচে পড়ে গেল। সোজা হয়েই পড়ল, বাচ্চারা একটুও জখম হয়েছে বলে মনে হল না। তারপর ঝড় থেমে গেলে, মেয়েদের মা রামুকে বললেন, 'ওরে, নিচে পড়ে থাকলে তো বেড়ালটাই ওদের সর্বনাশ করবে। বাসাটাকে বরং আবার গাছে তুলে দে। যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে।'

রামুর খুব উৎসাহ দেখা গেল না। সে বলল, 'আবার পড়ে যাবে।' মেয়েরা বলল, 'দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ্, তাহলে পড়বে না।' রামু বলল, 'অত সরু ডালে উঠতে গেলে ডাল ভেঙে পড়ে যাব।' সবাই বলল, 'না হয় ঠিক সেই জায়গায় নাই বাঁধলি। ঐ ডালেই একটু সরিয়ে বাঁধ না। বেশি দূরে হলে মা-বাবা খুঁজে পাবে না।'

শেষটা রামু তাই করল। বাসাসুদ্ধ পাখির ছানা পকেটে নিয়ে, সাবধানে গাছে উঠে, সেই ডালেরি একটু গোড়ার দিকে বাসাটা বেঁধে রেখে এল। সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ছানা পাখিদের ঐটুকু শরীর, তারা এই বড় বড় হলদে ঠোঁট হাঁ করে, খাবারের আশায় আঁকুপাঁকু করতে লাগল। মা-পাখি বাবা-পাখিরা মুখে পোকামাকড় নিয়ে ফিরেও এল। ফিরে এসে তারা পুরনো জায়গায় গিয়ে বাসা না দেখে, মহা ব্যস্ত হয়ে, খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। অথচ বাসাটা ছিল মাত্র দু হাত দূরে, ওদের চোখের সামনে! মেয়েরা কত করে নতুন জায়গাটা দেখাবার চেষ্টা করল, ওরা বুঝতেই পারল না।

আশ্চর্যের বিষয় হল, হন্যে হয়ে খুঁজেও তারা বাসাটাকে দেখতে পেল না! হয়তো বাসাটা এখন কাকদের এলাকায় পড়ে গেছিল, তাই ওদিকে তাকায়নি। এদিকে কাকরা এতক্ষণ নিজেদের বাসা থেকে মজা দেখছিল। এইবার তারা মহা উল্লাসে উড়ে এসে শালিক ছানাদের ঠোকরাতে আরম্ভ করল। মা-পাখি বাবা-পাখি ব্যস্ত হয়ে বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তারা কিছুই বলল না। দেখতে দেখতে কাকরা ছানাগুলোকে মেরে শেষ করে দিল। মেয়েদের দু চোখে জল।

খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে, মা-পাখি বাবা-পাখি বাসার পুরনো জায়গাটাতে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল তারা মহা উৎসাহে, আবার সেই একই জায়গায় নতুন করে বাসা বানাতে আরম্ভ করেছে। সেই বাসাতে তারা ডিমও পাড়ল, বাচ্চাও তুলল, কাকরা কিচ্ছু বলল না। তা বলবেই বা কেন, ওটা তো আর কাকদের এলাকা নয়।

গ্রাহক সংগ্রহ প্রতিযোগিতা—১৩৮৪

(১) প্রত্যেকটি বাৎসরিক গ্রাহকের জন্য ১·০০ এবং ষান্মাসিক গ্রাহকের জন্য ·৫০ পুরস্কার।

(২) নতুন গ্রাহকের চাঁদা দেবার সময়ে জানাবে যে তাকে গ্রাহক করলে। নতুন গ্রাহকও জানাবে 'অমুক আমাকে গ্রাহক করল।' নইলে আমাদের হিসাব ভুল হয়ে যায়।

(৩) যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গ্রাহক করবে, সে একটা বিশেষ পুরস্কার পাবে। কিন্তু অন্ততঃ পাঁচটি গ্রাহক সংগ্রহ না করলে এই পুরস্কার দেওয়া হবে না।

অ—নে—ক নতুন গ্রাহক সংগ্রহ কর।

১৩৮৩র গ্রাহক সংগ্রহ প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার দুই টাকা+বিশেষ পুরস্কার পাঁচ টাকা, ১২৮৫ অনন্যা দাশ।

প্রত্যেকে এক টাকা করে :—

২৩৭ প্রিয়দর্শী ও সুপ্রতীক মুখোপাধ্যায়, ৫১০ সংযুক্তা সোম, ৬৭৮ শ্রীরূপা ও অভীক সেনগুপ্ত, ৯৪৯ তন্ময় ও বর্ণালী বসু, ১১০১ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১১৪ অভিজিৎ ও সোমজিৎ দত্ত, ১৪৩৯ প্রেমাশিষ চট্টোপাধ্যায়, ১৫৬৪ অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার, ১৬৫৪ সুমনা চৌধুরী, ১৯২০ রজত, নন্দিনী ও অরবিন্দ রায়।

কারো হিসাব ভুল থাকলে তাড়াতাড়ি জানাও। চাঁদার সঙ্গে কাটাতে চাইলে, একমাসের মধ্যে কাটাও।

গ্রাহক কার্ড পেয়েছ কি ?

প্রত্যেক নতুন (ব্যক্তিগত) গ্রাহক সম্পাদকের সই করা একটা সুন্দর কার্ড পেতে পার। পুরোন গ্রাহক, যারা পাওনি, তারাও পাবে। এখনই গ্রাহক কার্ডের জন্য চিঠি লেখো।

ইতি—সঃ সঃ

পুরোন সন্দেশে বিশেষ কমিশন

আগামী ১৮ই বৈশাখ থেকে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত (১লা থেকে ৩১শে মে) পুরোন সন্দেশে সাধারণ রিবেটের উপর আরো ২০% বিশেষ নববর্ষ কমিশন পাওয়া যাবে।

	সাধারণ	বাঁধানো
১৩৮১ (সম্পূর্ণ বছর)	১০'৫০	১৩'০০
১৩৮২ (সম্পূর্ণ বছর)	১২'৫০	১৫'০০
১৩৮৩ (সম্পূর্ণ বছর)	১৪'৫০	১৭'০০

দুই অথবা তিন বছরের বই একসঙ্গে নিলে ১ বা ২ টাকা রিবেট পাবে।

পুরোন শারদীয়া সংখ্যা—১৩৮৩ = ৪'০০, ১৩৮২ = ৩'০০, ১৩৮১ = ২'০০
১৩৮০ = ২'০০, ১৩৭৫ = ১'০০

২-৩-৪ বা ৫ বছরের একসঙ্গে নিলে ১-২-৩ বা ৪ টাকা রিবেট

অন্যান্য বছরের অল্প কয়েকটি বই এখনও অবশিষ্ট আছে, পুরো দামে কেনা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মূল্য ও রেজিঃ ডাকে পাঠাবার খরচ অগ্রিম পাঠালে, ডাকেও বই পাঠানো যেতে পারে।

একসঙ্গে সুদ এবং বীমা!
ইউবিআই-এর নতুন প্রকল্প

৫০০ টাকা বা তদূর্দ্ধ টাকা ৬১ মাসের ফিকস্‌ড ডিপজিটে রাখলে বছরে শতকরা ১০ টাকা সুদতো পাচ্ছেনই, তার উপর পাচ্ছেন বিনা প্রিমিয়ামে একটি জনতা দুর্ঘটনা বীমাপত্র। সঞ্চয়ের মেয়াদকালে আপনার নিম্নলিখিত নিরাপত্তা থাকবে।

(ক)	দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু	১০,০০০ টাকা
(খ)	দুর্ঘটনায় দুটি চোখ বা হাত ও পায়ের যে কোন দুটি নষ্ট হলে	১০,০০০ টাকা
(গ)	দুর্ঘটনায় একটি চোখ বা যে কোন একটি হাত বা পা নষ্ট হলে	৫,০০০ টাকা
(ঘ)	চিরকালের জন্য সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা লোপে	১০,০০০ টাকা
(ঙ)	প্রতিটি দুর্ঘটনার ফলে হাসপাতালে চিকিৎসা বাবদ	২০০ টাকা
(চ)	প্রাপ্য আদায়ের সহজ ব্যবস্থা।	

ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির নাম ঃ- ইউনাইটেড ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ
ন্যাশান্যাল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ
নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোঃ লিঃ এবং
ওরিয়েন্টাল ফায়ার অ্যাণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোঃ লিঃ

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UB:PUB 277 B.

শৈবাল চক্রবর্তী

হাতে-লেখা পত্রিকা বার করা নিশ্চয় কোন কুকর্মের তালিকায় পড়ে না ; অথচ এ কাজটা করতে গিয়ে সামন্তমশাইকে যে এমন দুর্দশায় পড়তে হবে এটা কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল ?

নিজের নানা ঝক্কি সামলানোর পরেও যে আরও কত উটকো খেয়ালে মাততে পারেন সামন্তমশাই, এটা ভেবে আমরা সকলেই বেশ অবাক হয়েছিলাম।

পত্রিকার নাম দিলেন তিনি 'ফোয়ারা' আর লেখাও আসতে লাগল ফোয়ারারই তোড়ে। এটার কারণ আর কিছুই না—পত্রিকার বিজ্ঞাপনের জন্য সামন্তমশাই অনেক করেছিলেন। ছেলেমেয়েরা তো বটেই, তাদের দাদু, জেঠু যারা এতদিন তাস খেলে, হুঁকো টেনে সময় কাটাতেন এখন সে সব ফেলে কেউ গল্প, কেউ ভ্রমণকাহিনী লিখতে বসে গেলেন। ঘুঘুর জ্যাঠামশাই তো দু দিনে কাগজে পুরো জীবনীটাই লিখে এনে দিয়ে গেলেন ফোয়ারায় প্রকাশের জন্যে।

এদিকে সামন্তমশাইএর চক্ষু স্থির। এত লেখা কাগজে ধরাবেন কি করে ? আর পড়ে দেখবারই বা সময় কোথায় ? ভাবতে ভাবতে রোগা হয়ে গেলেন সামন্তমশাই, তবু লেখকদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। লেখা পড়ার জন্য তাঁকে শেষে নতুন করে চশমা নিতে হল। দুঃখের কথা আর কি বলব। চোখ দেখাতে গেছেন যে দোকানে সেই আঁখি-আলয়ের ডাক্তার তলাপাত্র রোগের সব ইতিহাস শুনে ট্যারা চোখের ওপর তাঁর এক দশ পাতার প্রবন্ধ ধরিয়ে দিয়েছেন সামন্তমশায়ের হাতে। নতুন চশমা লাগিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরে এলেন সামন্তমশাই।

যত লেখা জমল একা পড়ে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না সামন্তমশাই। অর্ধেক তিনি পড়তে লাগলেন, অর্ধেক দিলেন তাঁর চাকর কেষ্টাকে। কেষ্টা প্রাইমারী স্কুলের তিন ক্লাস অবধি পড়েছে, তাছাড়া এর আগে দপ্তরীখানায় বই বাঁধাইয়ের কাজ করেছে কিছুকাল। দপ্তরীর দোকানে এত বই বাঁধাই হয়েছে তার হাতে যে এখন লেখা হাতে পড়লেই তা ছাপার যোগ্য কিনা বলে দিতে দেরি হয় না তার এতটুকু।

শুধু যাতে আরও বেশি লেখা ফোয়ারায় ঠাঁই করে দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে কাগজটাকে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক করার প্রস্তাব হয়েছিল ! কিন্তু লেখা নকল করে যে সেই সঙ্ঘমিত্রা অত লেখালিখি করতে রাজি হল না। বলল, 'যা সব হাতের লেখার ছিরি আর খটমটে বানান। ওই যদি আমাকে রোজ নকল করতে হয় আমার নিজের লেখা-পড়াই তাহলে ডকে উঠবে।' এদিকে লেখকরা বিষম তাগিদ দিচ্ছে তাদের লেখা ঝটপট ফোয়ারায় প্রকাশ করে ফেলার জন্যে। কোনদিকে যান সামন্তমশাই ! দুএকজন ষণ্ডামার্কা লেখক তো তাঁকে রীতিমত শাসানি দিয়ে গেছে যে আগামী এক মাসের মধ্যে তাদের লেখা ফোয়ারায় না বেরুলে তারা তাঁকে দেখে নেবে।

অবস্থা যখন এইরকম ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন একদিন আমি গিয়েছি তাঁর বাড়ি।

ফোয়ারার মনোনীত ও অমনোনীত লেখার যে দুই

পাহাড়ের মধ্যেখানে মাথা গোঁজ করে বসে আছেন সামন্তমশাই। আমায় দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি করি বলতো জগা? কয়েকজন তো বেশ শাসিয়ে গেছে যে আগামী সংখ্যায় তাদের লেখা না বেরুলে তারা আমার রাস্তায় বেরুনো বন্ধ করে দেবে। এদিকে বিপদ দেখ না, বাড়িওয়ালা কালাচরণবাবুকে চিরকাল লোহা-লক্কড়ের কারবারী বলেই জানি। তিনি যে ভেতরে ভেতরে কবিতা লেখেন তা টের পাইনি কোনদিন। কাল ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে পঞ্চাশটা সনেট দিয়ে গেছেন তিনি, ফোয়ারার প্রতি সংখ্যায় একটি করে বার করার জন্যে। আজ যখন তাঁকে জানালুম যে এত লেখা বার করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে, চটেমটে তিন দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার নোটিস দিয়ে গেছেন এই দেখ'...

তাঁর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পড়লুম। দশ লাইনের লেখার মধ্যে তেত্রিশটা বানান ভুল! এই লোক যখন সনেট লিখবেন তখন সে যে কি জিনিস হবে ভেবে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার।

দাড়ি চুলকে সামন্তমশাই বললেন, এই সব কথাই ভাবছিলুম। এত লোককে ঠেকাই কি বলে! আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তো মুখ দেখাদেখি নেই। শ্বশুরমশাই অসুস্থ বলে চিঠি পেয়েছি, কিন্তু তাঁকে দেখতে যাওয়ার পথ বন্ধ! তাঁর একখানা উপন্যাস আমার কাছে পড়ে আছে আজ তিনমাস। এদিকে বাড়ি ছাড়ার নোটিস—চিন্তায় রাতে আমার ঘুম নেই। কদিন গা-ঢাকা দিতে পারলে হয়। ডাক্তারও বলছে শরীরের এই অবস্থায় আমার বিশ্রাম ও হাওয়া-বদলের বিশেষ দরকার।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে তাই করতে হল। সামন্তমশাই স্থির করলেন গিন্নীকে নিয়ে চলে যাবেন তিনধারিয়া। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি খালি পড়ে আছে, গিয়ে মাস খানেক থাকতে পারলে তদ্দিনে লোকে ফোয়ারা-কেলেঙ্কারির কথা ভুলে যাবে।

যাবার দুদিন আগে সামন্তমশাই চাকর কেষ্টাকে ডেকে বললেন, 'দুদিন সময় দিচ্ছি—ওই সব লেখাগুলোর একটা ব্যবস্থা কর। হয় ছালায় পুরে গঙ্গায় ফেলে দে, না হয় মাঠে ঘাটে কোথাও নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেল। যাবার আগে আমি এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যেতে চাই।'

কেষ্টা ঘাড় কাত করে এক গাল হেসে বলল, 'এর জন্যে আপনি ভাববেন না বাবু। আমার উপর যখন ভার দিয়েছেন তখন একটা হিল্লে করবই।'

সামন্তমশাইর ভাগনে ছক্কু মামার আশ্রয়ে থেকে একটা ডাক্তারী কোম্পানীতে কাজ করে। মামার কাছে তার পোজিশন খুব ভালো, কারণ আত্মীয়স্বজন চেনাশুনার মধ্য একমাত্র সে-ই ফোয়ারায় কোনো লেখা দেয়নি বা দেবে বসে শাসায়নি। তিনধারিয়া যাবার দিন সকালে মামা ভাগনেকে ডেকে বললেন, 'বাবা ছক্কু, তিনধারিয়ার নাম যেন কেউ ঘুণাক্ষরে না জানে। কেউ যদি জিগ্যেস করেত বলবি সামন্তমশাই সন্ন্যেসী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন; কোথায় যাচ্ছেন বলে যাননি।'

তিনধারিয়ায় তিন হপ্তা থাকার পরই সামন্তমশাই বুঝতে পারলেন যে তিনি ভারী হাল্‌কা বোধ করছেন।

ফোয়ারার ব্যাপারটা একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা মনে হচ্ছে, আর লেখার স্তূপের বিভীষিকাময় চেহারাটাও যেন মন থেকে মুছে এসেছে।

কলকাতায় হাঁটা হয় না; পাহাড়ে এসে সকাল বিকেল হাঁটা অভ্যেস করেছেন সামন্তমশাই। আজ গির্জেটা ছাড়িয়ে চৌমাথার কাছাকাছি আসতেই রাস্তার ধারের একটা মুদীর দোকান থেকে একটা তারস্বরে চীৎকার সামন্তমশাইরের কানে পৌছে তাঁর হাঁটা থামিয়ে দিয়ে তাঁর দৃষ্টি দোকানের দিকে ঘুরিয়ে দিল।

'এটাত আমার লেখা গল্প! আমি ফোয়ারা কাগজে পাঠিয়েছিলাম। সম্পাদক আমাকে কিচ্ছু জানান নি। এটা আপনারা পেলেন কি করে?'

কথাগুলো বলছে একজন বারো তেরো বছরের ছেলে। যাকে বলা হচ্ছে—অর্থাৎ মুদীমশাই নিজে—তিনি যে কী বলবেন.তা বুঝতেই পারছেন। ইতিমধ্যে ছেলেটির কিছু বয়স্ক আত্মীয়স্বজনও দোকানের সামনে এসে হাজির হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি ভদ্রলোকের কথা শুনে সামন্তমশাইএর রক্তের চাপ আরো বেড়ে গেল। 'শুধু ও কেন,' বলছেন ভদ্রলোক, 'আমিও ত পাঠিয়েছিলাম লেখা ওই একই কাগজে। সেও কি আপনার এখানে এসে জমা হয়েছে নাকি?'

সামন্তমশাই আর থাকতে পারলো না। তাঁর মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ দিয়ে কোনো মতে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরে এসে বৈঠকখানার সোফাতে ধপ করে বসে পড়লেন। গিন্নীর ত তাঁর অবস্থা দেখে চক্ষু স্থির। 'কী হয়েছে গো', বললেন তিনি, 'বেশি চড়াই উঠতে গেস্‌লে বুঝি? তোমার কি কোনো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই?'

'চড়াই উঠব কী গিন্নী' বললেন সামন্তমশাই, 'ফোয়ারায় ভূত! এই তিনধারিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে!'

ভূতের রহস্য শেষ পর্যন্ত সমাধান হল একটা চিঠিতে। পরদিন সকালে চিঠিটা পেলেন সামন্তমশাই। তার ভাগনে ছক্কু লিখছে কলকাতা থেকে:—

'মাই ডিয়ার মেজো মামা,

কেলেঙ্কারি ব্যাপার। তুমি পাহাড়ে গিয়ে বসে আছ। আর এদিকে তোমার টেবিলের উপর আবার কাগজের পাহাড়। এবারে আর লেখা নয়, লেখকদের চিঠি। এ পর্যন্ত সাড়ে তিনহাজার চিঠি এসেছে। পোস্টাপিস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তুমি কেষ্টাকে লেখাগুলোর একটা গতি করতে বলে গিয়েছিলে; সে দু'রাত জেগে সেগুলোকে ঠোঙায় পরিণত করে বাজারে বিক্রী করে। সেই ঠোঙা এখন মুদীর দোকান মারফৎ লেখকদের হাতে পৌছেছে, আর তার ফলেই এই চিঠি। তারা জানাচ্ছে লেখকগোষ্ঠী নাকি কোনো দিন কোনো পত্রিকার সম্পাদকের হাতে এমনভাবে অপমানিত হয়নি। এর মধ্যে কয়েকজন আবার খবর পেয়ে গেছে যে তুমি দার্জিলিং-এর কাছাকাছি কোনো একটা শহরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছ। এ অবস্থায় কী করা উচিত তুমি বিবেচনা করে স্থির কর; আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছে না।

ইতি অ্যাফ্‌লি

ছক্কু'

শোনা যাচ্ছে সামন্তমশাই এখন ভূটানে ব'সে তিব্বত যাবার যদি কোনো গুপ্তপথ থাকে তার অনুসন্ধান করছেন।

অজেয় রায়

কার অধিকারে?

বাস চলছিল গড়িয়ে গড়িয়ে, থেমে থেমে। চৌমাথা থেকে বাজার অবধি পথে বেজায় ভিড়। তাছাড়া প্যাসেঞ্জারও ওঠেনি তেমন; অনেক সিট খালি। হয়তো আরও লোক তোলার আশায় বাস আস্তে আস্তে এগুচ্ছিল। কন্‌ডাকটার ক্রমাগত চিৎকার করছে—'দুর্গাপুর, ইলেমবাজার, পানাগড়, দুর্গাপুর—চলে আসুন।'

আমি বসেছিলাম ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, চকচকে পিতলের রডগুলোর গায়ে কোণের সিটটায়। ওখান থেকে ড্রাইভারের হাব-ভাব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। ড্রাইভারের বাঁ পাশের সিটে একজন মাত্র যাত্রী। তার পায়ের কাছে মস্ত উঁচু এক লুঙ্গির গাঁটরি। লোকটি বৃদ্ধ। গায়ে ধুতি ও সার্ট, নাকের ডগায় গোল-ফ্রেম চশমা, রোগা চেহারা, মাথায় কদম ছাঁট পাকা চুল। সে বাসের ঝাঁকুনির তালে তালে টলটলায়মান লুঙ্গির মনুমেণ্টটিকে কোনো রকমে আঁকড়ে ধরে সামলাচ্ছিল।

ঘন ঘন থামছে গাড়ি, আবার বিন নোটিশে গোঁত্তা মেরে এগোচ্ছে। ফলে লোকটি গাঁটরি সামলাতে কিঞ্চিৎ বেগ পাচ্ছিল বোধ হয়। হঠাৎ সে বলল—'বাজারের পথটা পেরোতে আর কতক্ষণ লাগবে হে?'

সঙ্গে সঙ্গে—ঘ্যাচ! ব্রেক কষল বাস। যুবক ড্রাইভার আধ খাওয়া বিঁড়িটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাঁটরির মালিকের মুখোমুখি ঘুরে বসে কড়া গলায় বলল—'কি মশাই, ভদ্রতা জানেন না? আমায় "হে" বললেন যে, এ্যাঁ! কোন অধিকারে? কি রাইট আপনার?'

আচমকা ড্রাইভারের এই রুদ্রমূর্তি দেখে লোকটি থতমত খেয়ে গেল। কাঁচুমাচুভাবে ক্ষীণ হেসে বলল, 'এঁহে, তা অধিকার একটু আছে তো—'

ড্রাইভারের তর্জনে বৃদ্ধের বাকি কথা আর শেষই হল না।

—'বটে? আবার অধিকার ফলানো হচ্ছে? বলতে চান বয়সে বড়? তবে আর কি, একে-বারে-মাথা কিনে নিয়েছেন। যা খুশি তাই বলা যাবে।'

'না, মানে, আমি -' বৃদ্ধ মিনমিন করে কি বলতে যেতেই এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল ড্রাইভার।

—'থাক থাক আর ন্যাকা সাজবেন না। হে-টে আবার কোন দিশি ডাক? যত্তসব অভদ্র। আমাদের বুঝি প্রেস্টিজ-টেস্টিজ নেই? বলি, কোট-প্যান্ট পরা বাবু হলে এমন হে-টে বেরুত মুখ দিয়ে?' তার গজর গজর আর থামে না। বেচারা বৃদ্ধ ঘাবড়ে গিয়ে চুপ। সে বিমর্ষভাবে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল। বুঝলাম, ড্রাইভারটির আত্মসম্মান খুব প্রখর এবং হে সম্মোধনে বিশেষ আপত্তি আছে।

ড্রাইভারের বকুনি অবশ্য বেশিক্ষণ চলার সুযোগ হল না। অন্য যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠল—'ও দাদা, এবার স্টার্ট দিন, লেট হয়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে লেকচার হোক'······ইত্যাদি।

তাড়া খেয়ে বাস ছাড়ল। বার কয়েক নিজের মনে বকবক করে ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট বাঁচাতে মন দিল!

জানলা দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। দু'পাশে উদার মাঠ, দিগন্ত-বিস্তৃত ক্ষেত। গোছা গোছা হলুদ শীষভরা ধানগাছের ডগাগুলো হাওয়ায় ঢেউ খেলছে। মাছে মাঝে আলের পথ বেয়ে হন্ হন্ করে চলেছে কর্তা, তার ঘাড়ে রঙেচঙে টিনের বাক্স। চার-পাঁচ হাত পিছনে চলেছে ঘোমটা ঢাকা স্ত্রী; কাঁখে ছেলে। অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে, আবার দৌড়ে গিয়ে ধরছে স্বামীকে। মাথায় তরিতরকারি নিয়ে যাচ্ছে হাটুরে। রাখাল ছেলেরা দূর থেকে মুখ ভেঙাচ্ছে বাসের প্যাসেঞ্জারদের। রাস্তার ধারে বড় ছোট পুকুর। ঘাটে কাপড় কাচছে বৌ-ঝিরা। ছোটছেলেরা সাঁতার কাটছে আর তোলপাড় করছে জল। কোথাও জলের ধারে ছিপ হাতে ধ্যানমগ্ন একটি লোক, অন্য পারে একই ভঙ্গীতে এক বক। কখনও সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে লম্বা লেজওলা ফিঙে। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ড্রাইভার ও গাঁটরির মালিক সেই বৃদ্ধের মধ্যে নিচুস্বরে কি জানি কথা-বার্তা হচ্ছে।

অবাক হয়ে দেখি, প্রায়ই বাস থামলে ড্রাইভার নিজে থেকেই ঘাড় বাড়িয়ে দেয় বৃদ্ধের দিকে। চাপা স্বরে কথা হয়। বৃদ্ধের কথায় ড্রাইভার ঘনঘন মাথা দোলায়, হাসে। বাঃ, ড্রাইভারের রাগ দেখছি পড়ে গেছে। বোধ হয় বৃদ্ধের ওপর একটু বেশি রকম মেজাজ দেখানো হয়ে গেছে ভেবে সে এখন লজ্জিত। তাই আলাপ-টালাপ করে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

এক স্টপেজে ড্রাইভারের কোনো চেনা লোক তাকে একটি সিগারেট অফার করল। দেখলাম, ড্রাইভার একটু বিব্রতভাবে চোখ টিপে তাকে ইশারা করল—না। ফের সে বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

এমনি চলল পানাগড় অবধি।

পানাগড়ে বাস থামতে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল, নামবে বলে। পাশের দরজা খুলে তড়াক করে লাফিয়ে রাস্তায় নামল ড্রাইভার। ছুটে গিয়ে হাজির হল বাসের সিঁড়ির মুখে। নিজেই টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল লুঙ্গির গাঁটরি। —'রিকসা, এ্যাই রিকসা।' হাঁক পাড়ল সজোরে। বাসের ছোকরা

হেল্‌পারকে ডাক দিল—'ওরে কেষ্টা, রিকসায় তুলে দে মালটা।' তারপর সে এক ছুটে ঢুকল সামনের মিষ্টির দোকানে।

বৃদ্ধ ও মাল সাইকেল-রিক্সায় উঠল। হন্তদন্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভার। হাতে একটা হাঁড়ি, খুব সম্ভব মিষ্টি আছে তাতে। বৃদ্ধের কোলে সে গুঁজে দিল হাঁড়িটা। টুকরো টুকরো কথা এল কানে—'বাড়ির ছেলে-মেয়েদের জন্যে। নানা, তাতে কি, এই সামান্য—' হাত কচলাতে সে টুক করে একটি পেন্নামও ঠুকে দিল বৃদ্ধকে।

রীতিমত আশ্চর্য হলাম। ড্রাইভারটির রাগ ও প্রায়শ্চিত্ত দুই-ই দেখছি বাড়াবাড়ি ধরনের। রিক্সা ছেড়ে দিতে ও ফিরে এল। মাথা নেড়ে সামনে বিড়বিড় করছে 'আরে ছি ছি। আরে ছি ছি—কি কাণ্ড!

বেজায় কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম—'কি ব্যাপার মশাই?'

সে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আর বলবেন না স্যার, কেলেংকারি!!'

'কেন? কে উনি?'

ড্রাইভার চোখ বড় বড় করে বলল, 'মামাশ্বশুর!'

বললাম, 'সে কি, মামাশ্বশুরকে চিনতে পারেন নি।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'কি করে চিনব বলুন, একটিবার মাত্র দেখেছি। সেই বিয়ের সময়। বছর খানেক আগে ওই হট্টগোলের মাঝে কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সবাইকে মনে আছে ছাই। হঠাৎ সন্দেহ হল কেমন চেনা চেনা ঠেকছে। আর কি সব বলছিল, অধিকার টধিকার আছে, ভাবলাম একটু খোঁজ নি তো। ব্যাস, বেরিয়ে গেল—কুটুম্ব। একেবারে সাক্ষাৎ গুরুজন। পানাগড়ে কাপড়ের দোকান আছে! বউ ছেলেবেলায় কয়েকবার এসেছে এনাদের বাড়ি। ইস্‌, বউয়ের কানে যদি ঘটনাটা যায়?'

ফোঁস্‌ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে ড্রাইভার বলল—'ওনার ব্যাভারটাও কিন্তু উচিত হয় নি, যাই বলুন। উঠেই পরিচয় দে, না ঘাপটি মেরে মজা দেখছেন। বললেন, বাবাজী আমায় চিনতে পার কিনা পরখ করছিলুম।'

আমার দিকে কাতর চোখে চেয়ে সে বলল—'এক কে-জি স্পেশাল রাজভোগ দিলাম। পড়বে না রাগটা? বউয়ের কাছে আর বোধ হয় কথাটা তুলবেন না। কি বলেন দাদা?'

আমি ভরসা দিলাম, 'কিছু ঘাবড়াবেন না। আমার তো মনে হল উনি মোটেই চটেন নি। বেশ হেসে কথা-টথা বলছিলেন দেখলাম।'

—'ও ড্রাইভার দাদা। ছাড়ুন ছাড়ুন। লেট হয়ে যাচ্ছে—' বাসের যাত্রীরা চিৎকার শুরু করল। কন্‌ডাকটারও ঘন্টি মারছে ঘনঘন। ড্রাইভার আমার কাছে আরও একটু সান্ত্বনা পাবার আশায় ছিল। তাড়া খেয়ে মহা বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে ঘ্যাচ করে এক্‌সেলারেটার চাপল। ঝাঁকুনি খেয়ে এগোল বাস।

বাজ বাহাদুরের প্রাসাদের পাঁচিলের ধারে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে মালু বলে উঠল, 'আমি যদি রাণী রূপমতী হতাম, বেশ হত।'

নর্মদা নদীর দুটি ছোট শাখা দুদিক দিয়ে ঢুকে এসে মাণ্ডুর উত্তরে সাঁড়াশীর মতন ডবল খাদের সৃষ্টি করেছে। ফলে বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম-ঘেঁসা এই পাহাড়-ঘেরা মালভূমিটুকু যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মালভূমির দক্ষিণপ্রান্তে সুলতান বাজবাহাদুরের প্রাসাদের পরেই খাড়া পাহাড়ের গা নেমে গেছে নিমারের সমতল-ভূমি পর্যন্ত। সবুজ সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে, দেখা যায় নর্মদানদী এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। মনে হচ্ছে যেন আমরা বর্তমান কাল ছেড়ে চলে গেছি কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে। আমরাই মুগ্ধ হয়ে গেছি। আর মালু তো বোধ করি মনে মনে গণ্ডা কতক পদ্যই লিখে ফেলল!

উদাস দৃষ্টিতে দূরে নর্মদার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মালু আবার বলল, 'আমি যদি রাণী রূপমতী হতাম তাহলে সত্যি খুব ভাল হত!'

বুলু ধুয়ো ধরে বলল, 'তুই বেশ রূপমতীমহলের ছাদে বসে নর্মদার দিকে তাকিয়ে, বীণা বাজিয়ে গান করতি'—

কালু ঠাট্টা করে বলল, 'আর কাঁকন বাজিয়ে পোষা ময়ূর নাচাতি। স্কুলে যেতে হতনা, বেশ মুখ্যু হয়ে'—

'নাগো মহাশয়া', বাধা দিয়ে মালু বলল, 'রাণী রূপমতী রীতিমত ভাল কবিতা লিখতে পারতেন!'

'তবে আর কি, কবিতা যখন লিখতেন, তার সাত খুন মাপ!'

'বারে, তিনি তো খুব বুদ্ধিমতী আর বিদুষী ছিলেন'। বলল মালু।

'তখনকার হিসেবে হয়তো সত্যিই বিদুষী ছিলেন। কিন্তু রাজঅন্তঃপুরের সেই প্রায়-বন্দিনী অবস্থা'—

'তা কেন হবে, রাণী রূপমতী তো ঘোড়ায় চড়ে বাজবাহাদুরের সঙ্গে শিকারে যেতেন, বেড়াতে-টেড়াতেও যেতেন নিশ্চয়।'

কালু কিছু জবাব দেবার আগেই আমি বলে উঠলাম,

'রাণী রূপমতীর আলোচনা ছেড়ে এবার ফেরার জোগাড় কর—বেশি দেরি হলে কি হবে মনে আছে?

'আর কোনদিন আমাদের চারজনকে একলা-একলা বেরোতে দেওয়া হবে না'—

'মানে, প্রায়-বন্দিনী অবস্থা আর কি'—

'দরকার নেই বাবা, তার চেয়ে কদিন লক্ষ্মী মেয়ে সেজে থাকা যাক।'

'মনে হচ্ছে যেন নিচে মেসোমশাইরা এলেন', বলল কালু।

'কার মেসোমশাই?' জিজ্ঞেস করল বুলু।

মালু বলল 'কেন, তোর, কালুর আর টুলুর মেসোমশাই।'

আমি বললাম 'নারে, বোধহয় কালুর, মালুর আর বুলুর মেসোমশাই।'

বুলু রেগে গেল, 'কি যে সব হেঁয়ালি করিস কিছুই বুঝি না!'

সত্যিই প্রাসাদের নিচের তলা থেকে চেনা গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল কিন্তু কার গলা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

সিঁড়ির দিকে এগোতে-এগোতে কালু বলল 'আমার মনে হচ্ছে যেন মালু, বুলু ও টুলুর মেসোমশাই এসেছেন'—

মালু এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ডেকে বলল, 'তোরা সবাই ঠিক বলেছিস আবার সবাই ভুল বলেছিস! আমাদের সকলের বাবারা আর মেসোমশাইরা এসে গেছেন!'

দেখি সত্যিই তাই। তাঁরা বললেন, 'সারাদিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। এবার সবাই ট্যুরিস্ট বাংলোয় ফিরে গিয়ে স্নান-খাওয়ার জোগাড় করতো দেখি।'

গল্প করতে করতে সবাই মিলে বাজবাহাদুরের প্রাসাদ থেকে বেরোলাম।

পাশেই রেবা কুণ্ড দেখে মালু বলল 'এই কুণ্ডের সঙ্গে নর্মদা-নদীর যোগ আছে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, না?'

আমি বললাম 'তাহলে রেবা-কুণ্ড নাম হয়েছে কেন?'

'নর্মদানদীর আর একটা নাম তো রেবা, শুনলিনা'—

কালু রেগে গেল, 'কে এক বুড়ো কতগুলো আজগুবি গালগল্প, শোনাল, আর অমনি সে সব বেদবাক্য বলে মেনে নিলি!'

মালুও চটে উত্তর দিল, 'তোর পছন্দ না হলেই সব কিছু আজগুবি হয়ে যাবে নাকি? সত্যি-সত্যি ওরকম ঘটে থাকতে পারে না? হয় তো, অনেকদিন আগে'—

বাধা দিয়ে কালু বলল, 'অনেকদিন আগে নর্মদানদীর জল ওপরদিকে উঠেছিল, আর এখনও উঠছে! বুড়ো বললেই বিজ্ঞানের নিয়মগুলো উল্টে যাবে নাকি?'

'তাহলে রেবা-কুণ্ডে এত জল কোথা থেকে আসছে বল? কোনো ঝরনা তো এসে পড়েনি, যদি নর্মদার সঙ্গে যোগ না থাকে'—

'বাইরে থেকে ঝরনা এসে পড়েনি, হয়তো কুণ্ডের তলায় জলের উৎস আছে'—

'ভারি সবজান্তা হয়েছিস! উৎস আছে তার প্রমাণ কি?'

'বাইরে থেকে যদিও জল আসছে না, তবু কুণ্ডে জল ভরছে, এটাই তো প্রমাণ'—

কালুর সঙ্গে যুক্তিতর্কে এঁটে উঠতে না পেরে মালু আপিল করল কালুর বাবার কাছে, 'আচ্ছা মেসোমশাই, বাইরে থেকে ঝরনা এসে পড়েনি এতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে রেবাকুণ্ডের তলায় জলের উৎস আছে? কেন, সেই ইন্দোরের বৃদ্ধের কথা ঠিক হতে পারে না? ভিতরে ভিতরে নর্মদানদীর সঙ্গে রেবাকুণ্ডের যোগ থাকতে পারে না?' আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

কালুর বাবা বললেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য সেই কথাই বলবে। কিন্তু ভানুপ্রকাশ জ্যোতিষীর গল্পগুলো কি রকম ইন্টারেস্টিং বলতো? বুড়ো বলে উড়িয়ে দিস না—ভদ্রলোক ইন্দোরের নাম-করা সাহিত্যিক আর কবি।

মালু খুশি হয়ে বলল, 'শুনলি তো? আমার প্রথম থেকেই ভদ্রলোককে ভারি ভাল লেগেছিল।'

আমাদের সকলেরই অবশ্য ভাল লেগেছিল, কালু কিন্তু তবু গজ গজ করতে লাগল, 'কবি শুনেই গলে গেলি তো? কবি না হলে আজকের দিনেও ওরকম অবৈজ্ঞানিক কথা বলতে পারে কেউ?'

চারিদিক দেখতে দেখতে আমরা এগোচ্ছিলাম।

মালুর বাবা আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন, 'ঐ দেখ সেবিকা মহল।'

'কৈ?' 'কোথায়?' 'কি আছে ওখানে?', 'চলনা দেখি গিয়ে'—আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম সকলে।

বুলুর বাবা বললেন, 'গিয়ে দেখবার উপযুক্ত কিছুই আর অবশিষ্ট নাই এখন, কিন্তু এখান থেকেই একটা মজা দেখতে পাবে'—খুব জোরে তিনি হাঁক দিলেন, 'কোই হ্যায়!'

একটু পরেই প্রায় সমান জোরে প্রতিধ্বনি শোনা গেল, 'হ্যায়!!'

আমাদের প্রশ্নের শেষ নাই—'সেবিকামহল বলে কেন?', 'ওখানে কারা থাকত?', 'আমরা ডাকলেও উত্তর দেবে?'

কালুর বাবা বললেন, 'সেবিকামহল বলে কিনা জানি না, তবে শুনেছি ওখানে রাজপরিবারের সেবিকারা, মানে 'নার্স'রা থাকত। তাদের ডাকবার দরকার হলে এখান থেকে সংকেতে ডাকা হত।'

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা নানারকম চেঁচামেচি করে প্রতিধ্বনি শুনলাম; তারপর, সমস্বরে গান ধরলাম চারজনে :—

'ভূধর-কন্দর-বাসী প্রতিধ্বনি হে'—

প্রতিধ্বনির উত্তর, 'ধ্বনি হে'—

'কাঁপায়ে ধরণী একবার গাও শুনি হে'—

উত্তর, 'শুনি হে'—

'এবার ফেরা যাক' বলে বড়রা রওনা হলেন, আমরাও গল্প করতে করতে পিছন পিছন চললাম।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি হিপি আমাদের লক্ষ্য করছিল, নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করছিল। আরো একটু দূরে পাগড়ি-মাথায়, ইয়া-বড়-দাঁড়ি-গোঁফ আর লম্বা বাঁকানো নাকওয়ালা, লাঠি হাতে একটি রাজস্থানী-পোশাক-পরা লোক ওদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। প্রাসাদে যাবার সময়ও এদের দেখেছিলাম।

কালু মালুকে ঠাট্টা করে বলল, 'তোর বন্ধু সেই হিপিরা এখনও তোর পিছন পিছন ঘুরছে'—

মালু একটু চটেই ছিল, গোমড়া মুখে বলল, 'কার পিছনে ঘুরছে কে জানে? তাছাড়া, ঐ রাজস্থানী লোকটিকেও আগে যেন দেখেছি?'

বুলু বলল, 'হিপি-দর্শনের বিষয়ে কালুরই তো বেশি কৌতূহল।' 'হিপিদের আবার বিশেষ কোনও দর্শন আছে নাকি?'

আমি বললাম, 'পাঁচমারিতে যে দুটি হিপি কালুর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিল, তাদের কথায় তো সেই রকমই মনে হয়েছিল।'

'এরাই যে তারা, তার প্রমাণ কি? আজকাল হিপিরা সর্বত্রই আছে আর সব হিপিরাই প্রায় একরকম দেখতে'—

বুলু বলল, 'তোরা সব সময়ে কেবল হিপিদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করিস হাল্কাভাবে, আমার কিন্তু কেমন ভয় ভয় করে'—

আমাদের হাসতে দেখে বুলু মরিয়া হয়ে বলে চলল, 'তোরা তো সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিতে চাস, আমার কিন্তু প্রথম থেকেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে'—

ততক্ষণে আমরা ট্যুরিস্ট বাংলোয় পৌঁছে গেলাম বলে শোনা হল না বুলুর কি সন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া সব ব্যাপারেই বুলুর এত বেশি ভয় আর সন্দেহ যে আমরা প্রায়ই তার কথায় কান দিই না—হেসেই উড়িয়ে দিই।

ট্যুরিস্ট বাংলোয় আমাদের তিনটে ফোর-সিটেড ঘর পাওয়া গেছিল, একটাতে আমাদের বাবারা, একটাতে মায়েরা, আর একটাতে আমরা চার বন্ধু থাকব, এরকম স্থির হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় মায়েরা একটু ভয় পাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম।

সমস্ত দিন রোদে-রোদে ঘুরবার পরে ভাল করে স্নান সেরে আরাম পেলাম। ফ্রক ছেড়ে, চারজনে চার রঙের, নতুন-কেনা রাজস্থানী ঘাগরা-ওড়না আর ঝুটো গয়না পরে সেজে নিলাম। এই ট্যুরিস্ট বাংলোটায় খাবার ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু মায়েরা স্নান-টান সেরে কখন জানি এখানকার আনাড়ি চৌকিদারের সাহায্যে দারুণ ভাল ভাল খাবার রেঁধে ফেলেছিলেন, যার গন্ধেই আমাদের জিভে জল এল আর প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়ে গেল।

খাবার পরে বড়রা আরাম করে লাউঞ্জে বসলেন। তখনও দিনের আলো রয়েছে তাই আমরা আরো একটু বেড়াবার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পেলাম অবশ্য এই সর্তে যে এখন আর ট্যুরিস্ট বাংলোর এলাকার বাইরে কোথাও যাব না। তাতেই আমরা খুশি হয়ে রাজি হলাম। কারণ পাহাড়-বনে ঘেরা, নির্জন পরিবেশে এই ট্যুরিস্ট বাংলোর বাগানটা মস্ত বড়। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতেই সন্ধ্যাটা চমৎকার কেটে যাবে। বাংলোর বাগানে কতরকম ফুল ফুটেছে, কত গাছপালা রয়েছে। সামনেই সাগর-সরোবর নামে বিশাল এক দিঘি, তাতে থরে থরে পদ্মফুল ফুটেছে। পশ্চিমে এবার সূর্য ডুবেবে আর পূর্বে মস্ত বড় থালার মতন গোল চাঁদ উঠি-উঠি করছে। আজ পূর্ণিমা নাকি?

সাগর সরোবরের চারিদিকে বড় বড় ঘাট আর বাঁধানো বসবার জায়গা আছে। একটা রাস্তা সরোবরের চারিদিকে ঘুরে এসেছে মনে হল, কোথাও জলের ধারে ধারে, কোথাও বা গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে।

বাংলোর ঠিক সামনের ঘাটের বেদিটা কয়েকটি হিপি এসে দখল করেছে দেখে আমরা সরোবরের পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। ঝোপের আড়ালে একটি রাজস্থানী পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এরা সেই হিপি আর সেই রাজস্থানী কিনা বুঝতে পারলাম না অন্ধকারে।

মালু অবশ্য কালুকে ঠাট্টা করতে ছাড়লো না, 'তোর হিপিরা দেখি এখানেও এসে গেছে।'

কালু উত্তর দিল, 'তোর রাজস্থানী বন্ধুও উপস্থিত!'

সরোবরের পাশের রাস্তা দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে দেখি দ্বিতীয় ঘাটের বেদিতে বসে সকালের সেই ইন্দোরের সাহিত্যিক পণ্ডিত ভানুপ্রকাশ জ্যোতিষী মৃদুস্বরে গান করছেন। বেশ মিষ্টি গলা। ভদ্রলোকের গুণ আছে অনেক দেখছি!

আমরা পাশ কাটিয়ে আরো দূরের ঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু জ্যোতিষীমশাই বলে উঠলেন, 'আরে, আমি রাণী রূপমতীর গান ধরতেই চারচারটি রূপমতী দেখি সশরীরে হাজির! এসো, এসো মা-লক্ষ্মীরা!'

এরপরে আর বৃদ্ধকে এড়ানো যায় কি করে? অবশ্য আমরা সে এড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম তাও নয়। কালু ঠাট্টা করলে কি হবে! আমাদের সকলেরই ভদ্রলোককে ভারি ভাল লেগেছিল। দারুণ ইণ্টারেস্টিং গল্প বলতে পারেন. আরো শুনতে ইচ্ছা করছিল।

'এখানে এসে বস মা লক্ষ্মীরা। এখনই পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। তোমরা চাঁদনী রাতের গান কর! জানো তো, রূপমতী নিজে কবিতা লিখে, সুর বেঁধে, চমৎকার গান গাইতেন।'

মালু আবদার করে বলে উঠল 'আগে আপনি রূপ-

মতীর গল্পটা আবার ভাল করে বলুন, তারপরে গান শোনাব'—

পাহাড় বনে ঘেরা এই নির্জন পদ্মদিঘির ধারে ঝিঁঝির ডাক. পাতার মর্মর, ফুলের গন্ধ আর চাঁদের আলো মিলে কেমন যেন একটা স্বপ্নময় কল্পলোকের সৃষ্টি করেছিল। সোজাসুজি গল্প না বলে জ্যোতিষীমশাই রূপমতীর কাহিনী অবলম্বন করে তাঁর নিজের রচিত লোকগাথা শুরু করলেন। গান ধরতেই গল্পটা যেন নতুন আর রহস্যময় মনে হল। আমরা যেন সব ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পেলাম।

দরিদ্র এক ভীলের মেয়ে সুন্দরী, বিদুষী, কবি রূপমতী শ্রাবণ পূর্ণিমায় নর্মদাতীরে দোলনায় দুলতে দুলতে নিজের মনে গান করছিলেন, লুকিয়ে তাঁকে দেখে আর গান শুনে সুলতান বাজবাহাদুর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। রূপমতীও রাজি। কিন্তু তাঁর জীবন যে নর্মদা-নদীর সঙ্গে জড়িত, নর্মদাতীর থেকে দূরে গিয়ে তো তিনি বাঁচবেন না!

নর্মদাদেবীর পূজো করে রূপমতী প্রার্থনা জানালেন, 'দেবী, ঘটনাচক্রে আমাকে দূরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে—তুমিও আমার সঙ্গে চল!'

দেবী বললেন, 'তথাস্তু! তোমরা রওনা হও, আমি তোমাদের পিছন পিছন আসছি। কিন্তু খবরদার, ফিরে দেখতে যেওনা কিন্তু।'

মাণ্ডুর পথে রওনা হলেন রূপমতী আর বাজবাহাদুর। পিছনে শুনতে পেলেন 'ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন'—ঠিক যেন কার নূপুর পায় চলার শব্দ। তাঁরা যতই এগোন, ঝুন-ঝুন শব্দও পিছন পিছন এগোতে থাকে। ক্রমে কুড়ি

মাইল দূরে মাণ্ডুতে পৌঁছে গেলেন রূপমতী আর বাজ-বাহাদুর, আর কিছুটা দূর গেলেই প্রাসাদে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু হায়! এতক্ষণে ধৈর্য ধরে থাকলেও, শেষ মুহূর্তে আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না, রূপমতী, নর্মদা-দেবীর নিষেধ আগ্রহ্য করে পিছন ফিরে তাকালেন।

অমনি ঝুন ঝুন শব্দ থেমে গেল, নর্মদা আর এক পাও এগোলেন না। কেবল সেইখানে, মালভূমির বুকে এক সুন্দর সরোবরের সৃষ্টি হল—সেটাই আজকের রেবা কুণ্ড।

তখন তো আর হাহাকার করে লাভ নেই। রূপ-মতীর অনুরোধে বাজবাহাদুর রেবাকুণ্ডের ধারে নতুন প্রসাদ বানালেন. যার দক্ষিণ প্রান্তে ছাদে বসলে দেখা যায় যে সুদূর উপত্যকার মধ্য দিয়ে নর্মদা বয়ে চলেছে পূর্ব-দিক থেকে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত। রেবাকুণ্ডের জলে স্নান ও পুজো সেরে রোজ রূপমতী সন্ধ্যাবেলা ছাদে বসে নর্ম-দার দিকে বেয়ে বীণা বাজিয়ে গান করেন—দিনের আলো ক্রমে মিলিয়ে যায়।—চাঁদনী রাতে চাঁদ ওঠে পূর্বগগনে।

সত্যিসত্যিই দিনের আলো ক্রমে মিলিয়ে গেল. পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় অদ্ভুত এমন একটা রোমান্টিক পরিবেশের সৃষ্টি হল যে বিংশ শতাব্দী ছেড়ে আমরাও যেন ষোড়শ শতকে সেই রাণী রূপমতীর সময়ে ফিরে গেলাম। স্পষ্ট যেন শুনতে পেলাম সেই রাজপ্রাসাদের নানা শব্দ—সুন্দরীদের পায়ের নূপুরের নিক্কন, দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ, আরো আরো কত নাম-না-জানা আওয়াজ। আমরা কি সত্যিই রাণী রূপমতীর সখী হয়ে গেলাম? আর ভানুপ্রকাশ জ্যোতিষী—তিনি কি সত্যিই এই বিংশ শতকের পণ্ডিত? না বাজবাহাদুরের সভার কোনো কবি?

গান শেষ করেও বহুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বৃদ্ধ কবি। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে বললেন, 'এবার তো ফিরতে হবে—এখনই আমাকে নিতে আসবে'—আমাদের মনে হল যেন ষোড়শ শতাব্দী থেকে ফিরতে হবে এবার আধুনিক যুগে, এই কথাই তিনি মনে করিয়ে দিলেন।

যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠে গেলেন জ্যোতিষীমশাই।

চাঁদের দিকে চেয়ে মালু আবার বলল, 'আমি যদি রাণী রূপমতী হতাম!' কালু কি একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।

বুলু বলল, 'আমরা কোথায় আছি ঠিক বুঝতে পারছি না। স্থান কাল সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! কেন বলতো?'

আমি বললাম, 'মালুকে সত্যিই রাণী রূপমতীর মতন দেখাচ্ছে, তাও বল্।'

'ভাগ, তোদের কাউকেই কি গণ্ডালু বলে মনে হচ্ছে? শুনলি না, জ্যোতিষীমশাই বললেন চার-চারটি মূর্তিমতী রূপমতী?'

'এগুলোকে রাণী রূপমতীর পোশাক বললেন কেন বল্‌তো? আমরা তো শুনেছিলাম যে এগুলো রাজস্থানী পোশাক!' কথা বলতে বলতে আমরা আবার আমাদের বাস্তব পরিবেশে ফিরে এলাম।

কালু বলল, 'রাজস্থান তো কাছেই—সোজা উত্তরে গেলে বোধ হয় একশ মাইলও হবে না'—

আমি বললাম 'হ্যাঁ, আমি যেন কোনো একটা বইতে ঐ সময়কার ছবিতে দেখেছি এই ধরনের পোশাকের ছবি। হয়তো রাণী রূপমতীরাও পরত।'—

কিছুক্ষণ চাঁদের আলোয় বসে গল্প করতে করতে আমরা সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ কালু একটা মস্ত হাই তুলল আর মালু চটাস করে মশা মারল!

বুলু ভয়ে ভয়ে বলল, 'বড্ড রাত হয়ে যাচ্ছে, এখানে আবার ডাকাত-টাকাত লুকিয়ে থাকতে পারে না ত? চম্বল উপত্যকা পার হয়ে এলাম'—

আমরা বুলুর কথায় হেসে উঠলাম, কারণ আসবার পথে উৎসের কাছে সরু চম্বল নদী যেখানে পার হয়েছিলাম সেখানে বনটন কিছু ছিল না। ডাকাতদের চম্বল উপত্যকা আরো অনেক উত্তরে।

আমি বললাম, 'ডাকাত না থাকুক. বাবা-মারা আছেন

—কথা শুনে না চললে তাঁরা তো রাগ করবেন।'

হাসতে হাসতেই বাংলোর দিকে রওনা হলাম, মালু সবার আগে ছিল। গাছপালার আড়ালে যেখানে পথটা একটু অন্ধকার, হঠাৎ সেখানে একাধিক লোকের নড়া, চড়ার আওয়াজে বুলু ভয়ে চিৎকার দিল আর কালু টর্চ জ্বেলে সামনে এগিয়ে গেল।

টর্চের আলোয় দেখি ডাকাত গুণ্ডা-টুণ্ডা নয়, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনটি হিপি! একজন ভাঙা হিন্দীতে মালুকে প্রশ্ন করল। 'রাণী রূপমতী আছে এখানে?' আমরা তো অবাক!! মালু থতমত খেয়ে চুপ করে রইল আর বুলু ঠাণ্ডা-হয়ে-যাওয়া হাতে আমার হাত চেপে ধরল। কিন্তু কালু রেগে হিপিদের এক ধমক দিল, 'এ সব আজে বাজে কথা আমাদের বলছ কেন?'

ওরা আমতা আমতা করে বলল, 'না না, তোমাদের দেখে ভেবেছিলাম—মানে তোমাদের পোশাক দেখে—কিছু মনে কর না!'

আমরা বাংলোর দিকে এগোলাম আর হিপিরা আমাদের ছেড়ে-আসা বেদিতে গিয়ে বসল।

বুলু ফিসফিস করে বলল, 'তবু মানবি না যে হিপিরা আমাদের পিছনে লেগে রয়েছে! যদি ওদের মধ্যে গুণ্ডা ডাকাত দুষ্টু লোক-টোক থাকে?'

কালু ধমক দিল, 'কোথাকার ভীতুরাম! হিপিদের পোশাক আর চালচলন অদ্ভুত বলেই কি তাদের দুষ্টু লোক বলে মনে করতে হবে?'

আমি বললাম, 'পাঁচমারির হিপিদের কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল। ওরা বলছিল যে সমাজের আচার আচরণ পোশাক-টোশাকের কড়াকড়ি নিয়ম ওদের ভাল লাগে না তাই ওরা খেয়াল-খুশি মতন ঘোরে'—

কালু বলল, 'তাছাড়া আরো বলেছিল যে ভারত-বর্ষের মতন যে সব দেশের খুব প্রাচীন ইতিহাস আছে, সে-সব দেশ তাদের খুব ভাল লাগে।'

'ওরা বলছিল যে ঐতিহাসিক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে টেড়াতে ওদের খুব ভাল লাগে, ওদের মনে হয় যেন ওরা সেই প্রাচীন যুগে চলে গেছে। মাণ্ডুতে এসে আমারও ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে রে'—

মালু বলল, 'আমারও। হিপিদেরও আমার এমনিতে ভালই লাগে। কিন্তু ওরা যে স্নান করে না, কাপড় ছাড়ে না, তাই গায় বড় গন্ধ!'

বুলু বলল, 'তারা তো সত্যি হিপি ছিল, এরা যদি মিথ্যা হিপি হয়?'

'সে আবার কিরে? এরা বুঝি হিপির ভূত?'

'তোদের সবটাতেই ঠাট্টা! এরা যদি নকল হিপি হয়? মানে, হিপির ছদ্মবেশে গুণ্ডা-টুণ্ডা হয়?' রেগে বলল বুলু।

'বুঝেছি, পুলিশের ভয়ে চম্বলের ডাকাতরাই বোধ হয় এখন হিপির ছদ্মবেশ ধরেছে'—বলল কালু!

'হয় তো আমাদের গায়ের গয়নাগুলোকে সত্যি হীরে মুক্তো মনে করেছে।'

'কিম্বা হয় তো ভেবেছে যে আমরা সত্যিই রাণী রূপ-মতী!'

মালু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, 'কিন্তু এর মধ্যে একটা রহস্য সত্যিই আছে রে—আমাদেরই ওরা বারবার রাণী রূপমতী বলছে কেন?'

'হঠাৎ আমি চ্যালেঞ্জ করাতে ঘাবড়ে গিয়ে, যা মুখে এসেছে আলতু ফালতু কথা বলে ফেলেছে'—বলল কালু।

'কিংবা ওরা মাণ্ডুতে এসে কল্পনা করছে যে রাণী রূপ-মতীর যুগে সত্যিই ফিরে গেছে! আমাদেরও তো কি রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল মনে নেই?'

আমার কথায় কালু বিরক্ত হল, 'যত সব আজেবাজে কবিত্ব আর কল্পনা! হয় তো বলবি যে মালু সত্যিই কোনো এক পূর্বজন্মে রাণী রূপমতী ছিল আর আমরা সব তার সখী-টখি কিছু ছিলাম!'

মালু চিন্তিত হয়ে বলল, 'কেবল আজই তো নয়, যেদিন ইন্দোরে এই পোশাকগুলো নতুন কিনে পরেছিলাম সেদিনও কয়েকটি হিপি হঠাৎ আমাকে রাণী রূপমতী বলে ডেকেছিল'—

এবার আমাদের অবাক হবার পালা। ইন্দোরের সেই একটা ঘিঞ্জি গলিতে আমরা দোকানে দোকানে

জিনিস ঘেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। তখন কয়েকটি হিপি এসে মালুকে কিছু বলেছিল বটে। আজকের মতনই মালু থতমত খেয়েছিল, বুলু ভয় পেয়েছিল, আর কালু এগিয়ে হিপিদের ধমক লাগিয়েছিল। ঠিক তখনই বাবা-মারা সামনের দোকান থেকে ডাক দিতেই আমরা চলে গিয়েছিলাম, হিপিরা কি বলেছিল মালুর কাছে শোনা হয় নি। তাছাড়া আমরা তো তখনও রূপমতীর গল্প শুনিনি, তাই মালু ওদের কথার কোনো মানেই বুঝতে পারে নি!

কালু বলল, 'তুই কি বলতে চাস যে ইন্দোরের সেই গলির মধ্যেও তোকে দেখে ওরা ঐতিহাসিক রাণী রূপমতী বলে মনে করেছিল? তার মানে কি ওদের মাথায় কিছু ছিট আছে?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আরো কি বলতে চাস যে পাঁচমারি থেকে একই হিপির দল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে? তারাই বলেছিল বটে যে এই সব ঐতিহাসিক জায়গায় এসে তাদের মনে হয় যেন সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গেছে। এরা কি তারাই?'

মালু একটু ভেবে বলল, 'না রে, পাঁচমারির হিপিদের গন্ধটা অন্যরকম ছিল।' আমরা হাসলাম, কিন্তু কালু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল করে ভেবে দেখতো, গন্ধটা ঠিক কি রকম ছিল?'

'ওরে বাবা, হিপির গন্ধের মধ্যে কোনো রহস্যের গন্ধ পেলি নাকি?'

* * *

আমাদের এডভেঞ্চারের কথা ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের পরিচয় কিছুটা জানা দরকার —অবশ্য সন্দেশের অধিকাংশ গ্রাহক-গ্রাহিকা আমাদের বেশ ভাল করেই চেনে।

কালু, মালু, বুলু আর আমি, মানে টুলু, ছোটবেলা থেকে কাঞ্চনপুরের কাছে একটা চমৎকার স্কুলে পড়ি আর সেই স্কুলেরই হোস্টেলে থাকি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব। আর আমরা নানা ধরনের রহস্যের সমাধান করে বেড়াই বলে বন্ধুরা আমাদের নাম দিয়েছে গোয়েন্দা গণ্ডালু।

আমাদের প্রত্যেকের বাবা-মা আমাদের সকলকেই খুব ভাল বাসেন। আমরা প্রত্যেকে বাকি তিনজনের বাবা-মাকে মাসিমা মেসোমশাই বলি—তাই নিয়ে অনেক সময়ে বেশ মজার মজার ভুল-বোঝাবুঝি হয়।

আমাদের কারোই নিজের দাদা-দিদি বা ভাই-বোন নেই। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মামা-কাকা-মাসি-পিসি আর সমস্ত আত্মীয় স্বজনরা আমাদের সকলকেই খুব ভালবাসেন। আমরা বেড়াতে খুব ভালবাসি বলে যিনিই কোনো ভাল জায়গায় থাকেন অথবা যান, তিনিই আমাদের চার বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেন। আমরা প্রায় প্রত্যেক ছুটির কিছুটা অংশ এইভাবে নানা দেশে বেড়িয়ে কাটাই। একটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আমরা যেমন রহস্য আর এডভেঞ্চার ভালবাসি। তেমনি রোমাঞ্চকর ঘটনা যেন আমাদের পিছু পিছু তাড়া করে বেড়ায়! যখনই যেখানে যাই, কোনো না কোনো রহস্যর সন্ধান পাই এবং তার সমাধান না করে ছাড়ি না। এর জন্যে আমরা অনেকবার দারুণ বিপদে পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি! যদিও সব কথা আমাদের বাবা-মাকে খুলে বলিনি, তবু তাঁরা যেটুকু জেনে ফেলেছেন, তাতেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে, বা তাঁদের কথা না শুনলে আর কোনোদিন আমাদের 'চারজনকে একলা একলা' বেরোতে দেবেন না। তাই আমরা স্থির করেছি যে এই ছুটিতে আর কোনো এডভেঞ্চার করা হবে না। লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকব আর বাবা-মার সব কথা মেনে, চলব। সত্যিই আমরা 'লক্ষ্মী' হয়ে থাকতে চেষ্টা করছি।

ওঃ—আসল কথাটাই যে বলা হয়নি। প্রত্যেকটা ছুটির অনেকগুলো দিন মাসি-মামা-কাকার বাড়ি ঘুরে আসি বলে আমাদের প্রত্যেকেরই বাবা-মারা অনুযোগ করেন যে আমাদের কারোই নাকি নিজের বাড়িতে মন টেঁকে না। আসল কথা অবশ্য তা নয়। আসলে আমাদের বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগে না কেবলই বেড়াতে ইচ্ছা করে। এই ছুটিতে আমাদের চারবন্ধুর বাবা-মারা একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন আর আমরা

চারজনে তাই খুশি মনে তাঁদের সঙ্গে এসেছি।

প্রথমেই আমরা হাওড়া থেকে বোম্বে মেলে, হিল্ কনসেশন টিকিট কেটে পিপাড়িয়া স্টেশনে নেমে, সাতপুরা পর্বতমালার ওপর পাঁচমারিতে গিয়েছিলাম। সেখানে দু-চারদিন থেকে, আমরা ইন্দোর গিয়েছিলাম। ইন্দোর থেকে, দুটো বড় মোটরে করে আমরা মাণ্ডুতে বেড়াতে এসেছি, এখানেও দু চারদিন থাকব। এর পরেই কিন্তু আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কালুর বাবা-মা ইন্দোরে ফিরে গিয়ে তাঁদের কোনো আত্মীয়ের বাড়ি থাকবেন ; মালুর বাবা-মা ভূপালে যাবেন, সেখানে তাঁদের সেগুনকাঠের ব্যবসা-সংক্রান্ত কি সব কাজ আছে ; আমার বাবা-মা যাবেন হোসাঙ্গাবাদে, কাকার বাড়ি ; আর বুলুর বাবা-মা কিছুদিন আগেই সমস্ত মধ্যপ্রদেশ ঘুরেছেন, তাঁরা পাঁচমারিতে ফিরে গিয়ে বাকি ছুটিটা কাটাতে চান। শেষে অবশ্য আমরা সকলেই আবার পিপাড়িয়াতে এসে, একসঙ্গে হাওড়া ফিরব।

আমাদের ইচ্ছেটা কিন্তু একটু অন্য রকম। আমরা চাইছি যে আমরা প্রথমেই (আমার) বাবা-মার সঙ্গে ধার বেড়িয়ে, বাঘ-গুহা দেখে, তারপর ইন্দোর যাব। কালুর বাবা-মা আমাদের ইন্দোর আর উজ্জয়িনী দেখাবেন তারপরে আমরা ভূপালে গিয়ে মালুর বাবা-মার সাহায্যে ভূপাল, সাঁচি আর বিদিশা দেখব। তারপরে যাব হোসাঙ্গাবাদ। কাকার কাছে শুনেছি যে সেখানে, নর্মদাতীরে বেড়াবার খুব ভাল জায়গা আছে ; তাছাড়া খবরের কাগজে দেখেছি যে কাছাকাছি পাহাড়ে প্রাচীন যুগের গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলো আমরা দেখতে চাই। তারপরে যে-যার বাবা-মার কাছে গিয়ে বাকি ছুটিটুকু কাটাব। বাবা-মারা অবশ্য এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় মত দেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হবেন এই আশায় আমরা খুব 'লক্ষ্মী' মেয়ে হয়ে রয়েছি আর তাঁদের সব কথা শুনে চলছি।

পরদিন ভোরে উঠে বেড়াতে বেরোলাম। কত কিছুই যে দেখবার জিনিস আছে এখানে! সেই দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে হিন্দুরাজা, পাঠান সুলতান আর মোগল সম্রাট কতজনে যে কত প্রাসাদ-মন্দির-মসজিদ-ইমারত স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন তার সীমাসংখ্যা নেই!

প্রথমেই আমরা সুন্দর শ্বেত পাথরের তৈরি হোশং শাহের মকবরা দেখলাম। তারপরে দেখলাম বিশালায়তন জামি মসজিদ। এর বিরাট বিরাট গম্বুজগুলি সত্যি দেখবার মত। আফগানদের তৈরি ইমারতগুলির মধ্যে নাকি এটাই শ্রেষ্ঠ। মস্ত বড় দুটো সরোবর কপুর তালাও আর মুঞ্জা তালাওর মাঝখানে সুন্দর সুন্দর গম্বুজ, খিলান আর মণ্ডপ দিয়ে সাজানো বিরাট জাহাজমহল প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন গিয়াসউদ্দিন খিলজি ; সরোবরের জলে ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে যেন সত্যিই জলে ভাসছে। পাশেই হিন্দোলামহল প্রাসাদটি একটা বিরাট দোলনার মতন দেখতে, এখানে সুলতানদের দরবার বসত। একপাশ দিয়ে ঢালু; চওড়া পথ উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। বেগমরা নাকি এই পথ দিয়ে সোজা হাতির পিঠে চড়ে দোতলায় উঠতেন আর পাথরের জালিকাটা জানলা দিয়ে সভার কাজকর্ম দেখতেন, তাই এই পথের নাম 'হাতি চড়াও।'

তারপর দেখলাম 'চম্পা-বাউলি' নামে, পাথর-বাঁধানো একটা বিরাট কুয়ো। এই কুয়োর ভিতরে নামবার জন্য সিঁড়ি আছে, জলের ধারে ছোট ছোট ঘর আর টানেলের মুখ দেখা যায়। কুয়োর জল তুলে ঢেলে নাকি এই সব সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে জলমহল আর জাহাজ মহল প্রাসাদের তলায় পৌঁছে যেত, আর গরমের দিনেও প্রাসাদের একতলার ঘরগুলি সুন্দর, ঠাণ্ডা হয়ে থাকত। আমরা সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে দেখলাম যে সুড়ঙ্গের মুখগুলি বেশ চওড়া। অনায়াসে, মাথা নিচু করে, গুঁড়ি মেরে তার ভিতর ঢোকা যায়। কালু আর মালুর ইচ্ছা ছিল যে ঐ টানেল দিয়ে ঢুকে কিছু দূর ঘুরে দেখে আসে, কিন্তু বড়রা কিছুতেই রাজি হলেন না। গাইডও বলল যে বহু বছর কেউ টানেলে ঢোকেনি, কোথাও ছাদটাদ ধ্বসে পড়েছে কিনা জানা নেই। সুতরাং ঢোকা নিরাপদ নয়।

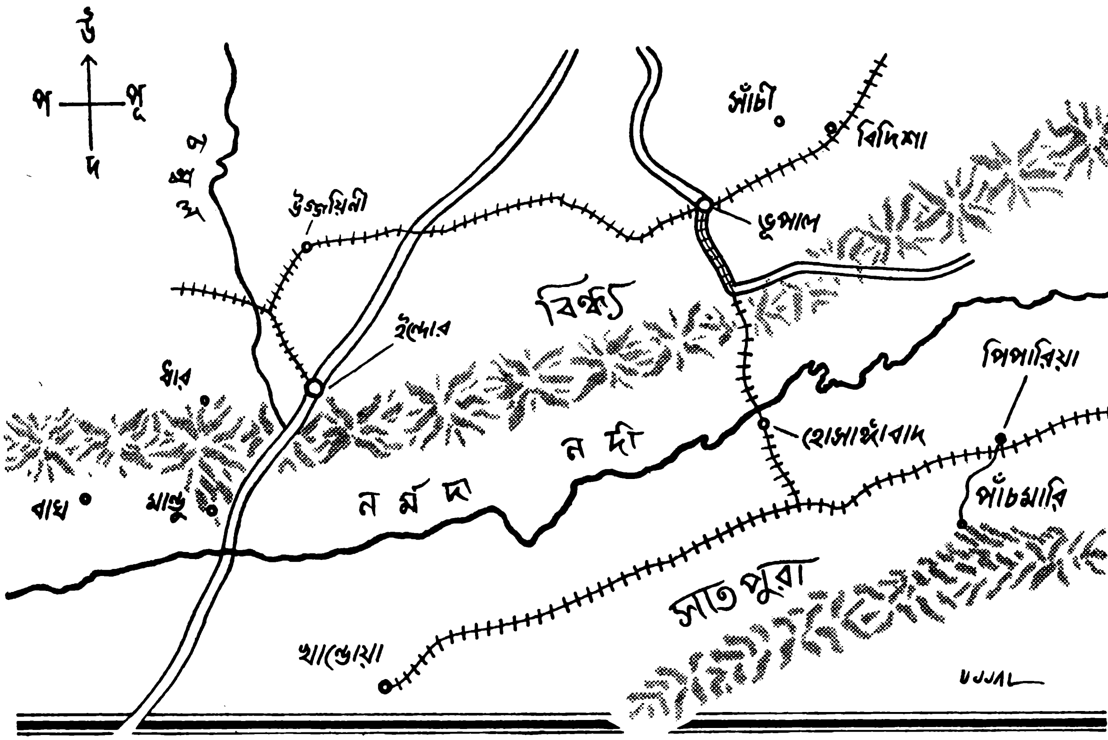

জলমহল প্রাসাদে যেতে পথে দেখলাম যে টানেল বরাবর মধ্যে মধ্যে, আলগা-পাথর দিয়ে ঢাকা, ছোট ছোট চৌকো ফাঁক আছে, ঠিক যেন আজকালকার 'ম্যানহোল।' পদ্মদিঘির ধারে, টানেলের জলে ঠাণ্ডা করে রাখা, সুন্দর জলমহল ছিল নূরজাহানের প্রিয় বাসস্থান। সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি ভালবাসতেন জাহাজমহল প্রাসাদে থাকতে। এই প্রাসাদে কেবল ঠাণ্ডা রাখার জন্য টানেল নয়, আবার শীতের দিনে গরম জলের জন্য আলাদা টানেলও আছে।

ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সকলেরই দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। আমাদের ট্যুরিস্ট বাংলোটা এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাছাড়া, আগেই বলেছি যে সেখানে ভালো খাবার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু, কাছেই একটা সৌখিন ট্যুরিস্ট লজে নাকি চমৎকার ক্যান্টিন আছে। এটার ভাড়া অনেক বেশি তাই এখানে প্রধানতঃ বড়লোক আর বিদেশী ট্যুরিস্টদেরই ভিড়। ক্যান্টিনে খাবারের অর্ডার দিয়ে বড়রা বারাণ্ডায় পেতে রাখা সৌখিন বেতের চেয়ারে বসলেন আর আমরা ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখতে লাগলাম।

মালভূমির একপ্রান্তে থাকার দরুণ এই ট্যুরিস্ট লজ থেকে সমতলভূমির দৃশ্য ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। নিচের দিকে কেবল বনজঙ্গল, শস্যক্ষেত, আর দূরে ছোট ছোট গ্রাম।

ট্যুরিস্ট লজের ঠিক সামনেই একটা দোকান দেখে সেখানে গেলাম। নানারকম খেলনা, পুতুল, ঘর সাজাবার জিনিস, পিকচার পোস্ট কার্ড, ট্যুরিস্ট গাইড-বুক ইত্যাদি সাজানো ছিল। ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মাণ্ডুর নানা কিংবদন্তীর ছবিও ছিল। ছবিতে রাণী রূপমতীর পোশাক সত্যিই রাজস্থানী ধরনের। রাণীর পোশাকের রঙ লক্ষ্য করে আমি সবে বলতে শুরু করেছিলাম, 'এইবার বুঝেছি কেন'—হঠাৎ বাধা দিয়ে মালু যেই বলল, 'হিন্দোলামহলে পিঙ্গলবর্ণের রাজপ্রাসাদ', সঙ্গে সঙ্গে কালুর নির্দেশ 'লুণ্ঠিত কোকনদ!' আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একটা শো-কেসের পিছনে চলে গেলাম, যেন সেদিকের জিনিসগুলো দেখছি।

আমাদের এই ভাষাটা শুনতে বিদঘুটে কিন্তু আসলে খুব সহজ, প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো নিলেই আসল মানেটা বুঝতে পারা যায়।

আমরা এত চট করে লুকিয়ে পড়েছিলাম যে হিপিরা আমাদের দেখতে পায় নি। সোজা এগিয়ে এসে তারা দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে রাণী রূপমতী আছে?'

দোকানদার রাণী রূপমতীর কয়েকটি ছবি এগিয়ে দিল। কোনোটাতে রাণী রূপমতী বীণা বাজিয়ে গান করছে। কোনোটাতে বা রূপমতী আর বাজবাহাদুরের পিছন পিছন নর্মদাদেবী আসছে। রূপমতী-কাহিনীর একটি বইও দিল, তবে সেটা হিন্দিতে লেখা। ওমা! এযে দেখি জ্যোতিষী মশাইর লেখা সেই লোকগাথাটাই!

হিপিরা সব কিছুই নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল, রাজস্থানী পোশাকপরা দু-একটা পুতুলও দেখল। এর পরে দোকানদার পিছনের গুদাম থেকে দু তিনটে নতুন পুতুল নিয়ে এল। হিপিরা চাপাস্বরে কি বলল, শুনতে পেলাম না, বোধ হয় দরদাম সম্বন্ধে কোনো কথা-টথা হল।

হঠাৎ কালু শো-কেসের আড়াল থেকে এগিয়ে এসে খেলনা আর পুতুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে রাণী রূপমতী আছে'? 'আছে বৈকি', বলে দোকানদার তাকেও রাণী রূপমতীর ছবিগুলো আর জ্যোতিষীমশাইর লেখা বইটা দেখাল।

ততক্ষণে আমরাও এগিয়ে এসেছি। জিনিসপত্র নেড়ে চেড়ে দেখছি। পাশেই হিপিরা দাঁড়িয়ে, তারাও জিনিস ঘাঁটছে। কিন্তু আমাদের দিকে তারা তাকিয়েও দেখছে না!

মালু কিছুক্ষণ পুতুলগুলো নিয়ে নাড়াছাড়া করল। তারপর হিপিদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'এই পুতুলটার পোশাকের রঙ আমার পছন্দ হচ্ছে না, আপনার পুতুলটা দিন না।' হিপিদের জন্য আনা পুতুলটা সে নিতে গেল। উত্তরে হাসা বা কথা বলা দূরের কথা, খুব লম্বা মেয়েটা ভ্রূকুটি করে, পুতুলটা মালুর হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, বিড় বিড় করে কি সব বলতে বলতে চলে গেল! দেখাদেখি অন্য দুটি হিপিও ছবি-টবি ফেলে রেখেই গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সেকিরে! ঐ মেয়েটিই না কাল গদগদ হয়ে তোর সঙ্গে আলাপ করতে এসে ছিল?'

মালু বলল, 'আমার সঙ্গে নয় রে, আমার পোশাকটার সঙ্গে। এখনকার পোশাকগুলো ওদের পছন্দ হল না!'

দোকানের বাইরে দেখি সেই লম্বা-নাক রাজস্থানী দাঁড়িয়ে। হিপিরা যেই চলে গেল, সেও তাদের পিছন পিছন রওনা দিল।

তখনই কালুর বাবা ডেকে বললেন যে খাবার তৈরি। আর কি আমরা এক মিনিটও দাঁড়াই? যা প্রচণ্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। হিপি আর রাজস্থানীদের সম্বন্ধে গবেষণা ছেড়ে এক দৌড়ে ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে খেতে বসে গেলাম।

[ক্রমশঃ]

২৪শে জুন

ইংলণ্ডের সল্‌সবেরি প্লেনে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে তৈরি বিখ্যাত স্টোনহেঞ্জের ধারে বসে আমার ডায়রি লিখছি। আজ মিড-সামার ডে, অর্থাৎ কর্কট-ক্রান্তি। যে সময় স্টোনহেঞ্জ তৈরি হয় তখন এদেশে প্রস্তরযুগ শেষ হয়ে ব্রঞ্জ যুগ সবে শুরু হয়েছে। মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখে দেখতে দেখতে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মিশর, ভারত, মেসোপটেমিয়া, পারস্য ইত্যাদির তুলনায় অবিশ্যি ইউরোপে সভ্যতা এসেছে অনেক পরে। কিন্তু চার হাজার বছর আগে এই ইংলণ্ডেই যারা স্টোনহেঞ্জ তৈরি করতে পেরেছে তাদের অসভ্য বলতে দ্বিধা হয়। বহুদূর থেকে আনা বিশাল বিশাল পাথরের স্তম্ভ দাঁড় করানো মাটির উপর, প্রতি দুটো পাশাপাশি

শঙ্কুর স্বর্ণ সুযোগ

প্রোফেসর শঙ্কুর
ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চার
উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়

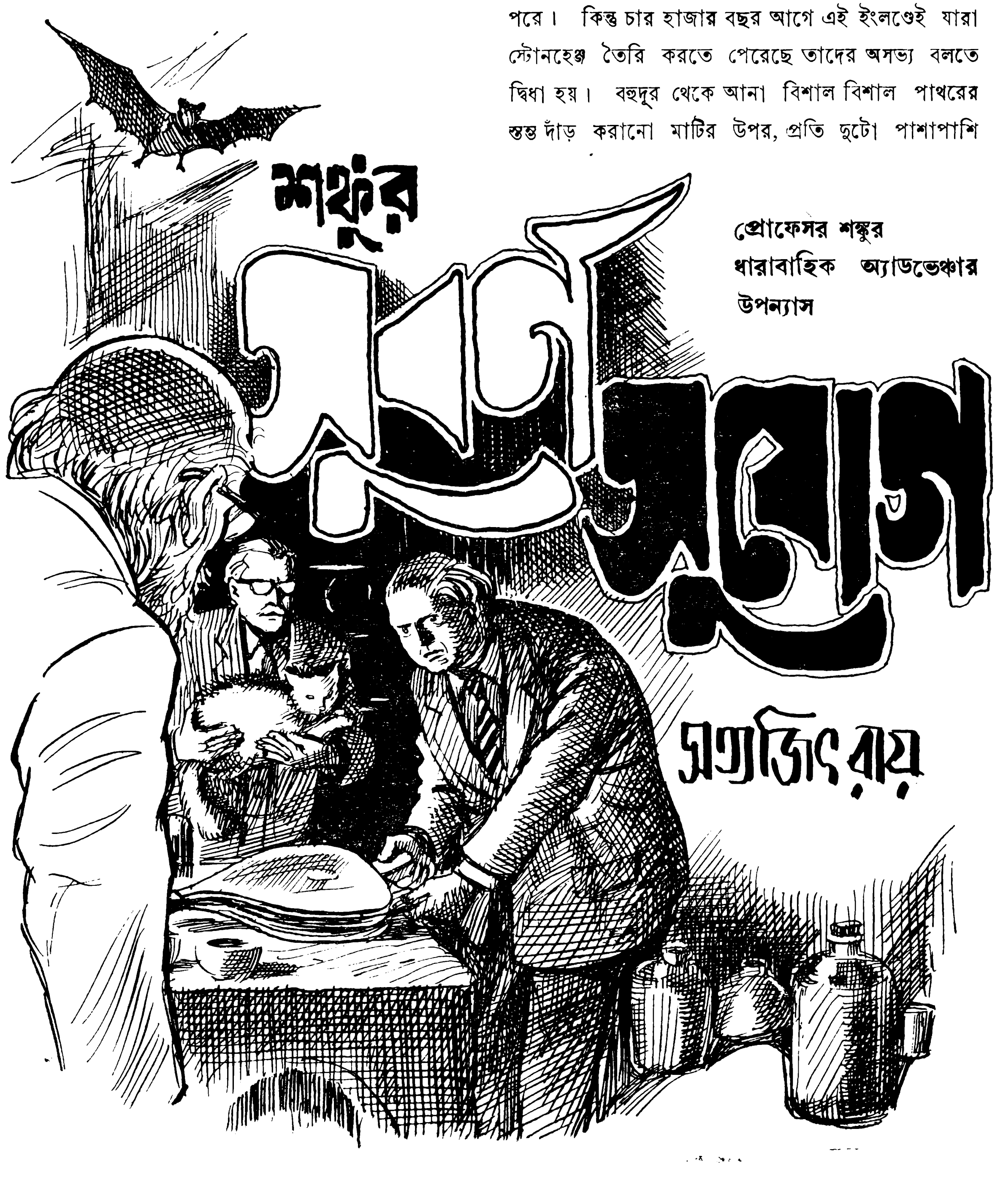

স্তম্ভের উপর আবার আড়াআড়ি ভাবে রাখা হয়েছে আরেকটা পাথর। এই পাশাপাশি তোরণগুলো আবার একটা বিরাট বৃত্ত রচনা করেছে। অ্যাদ্দিন লোকের ধারণা ছিল এই স্টোনহেঞ্জ ছিল কেল্টদের ধর্মানুষ্ঠানের জায়গা। এই কিছুদিন হল প্রত্নতাত্ত্বিকরা বুঝেছে যে এটা আসলে ছিল একটা মানমন্দির। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানমন্দিরের অন্যতম—কারণ পাথরগুলোর অবস্থানের সঙ্গে সূর্যের গতিবিধির একটা পরিষ্কার সম্বন্ধ পাওয়া গেছে, যেটা বিশেষ করে আজকে অর্থাৎ ২৪শে জুন কর্কটক্রান্তিতে সবচেয়ে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে। ভাবতে অবাক লাগে যে আজকের দিনে আধুনিক এঞ্জিনিয়ারিং বলতে আমরা যা বুঝি তার অভাবে সেকালে কী করে এই পাথরগুলোকে এমনভাবে হিসেব করে বসানো হয়েছিল। আমার বন্ধু ক্রোল অবিশ্যি অন্য কথা বলে। তার ধারণা প্রাচীনকালে মানুষ এমন কোনো রাসায়নিক উপায় জানত যার ফলে সাময়িকভাবে পাথরের ওজন কমিয়ে ফেলা যেত। সেই কারণে নাকি পিরামিড বা স্টোনহেঞ্জের মতো জিনিস তৈরি করা আজকের চেয়ে সেকালে অনেক বেশি সহজ ছিল। উইলহেল্ম ক্রোল চিরকালই আদিম মানুষের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। প্রাচীন যাদুবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব, উইচক্র্যাফ্‌ট ইত্যাদি নিয়ে তার অগাধ পড়াশুনা। সে আমার সঙ্গে তিব্বতে গিয়েছিল একশৃঙ্গ-অভিযানে। এখন সে স্টোনহেঞ্জেরই একটা পাথরে হেলান দিয়ে ঘাসের উপর বসে একটা বিশেষ রকমের বাঁশি বাজাচ্ছে যেটা সে তিব্বতের একটা গুম্ফা থেকে সংগ্রহ করেছিল। এ বাঁশি মানুষের পায়ের হাড় দিয়ে তৈরি। এ থেকে যে এমন আশ্চর্য সুন্দর জার্মান লোকসংগীতের সুর বেরোতে পারে তা কে জানত?

ক্রোল ছাড়া তিব্বত অভিযানে আমার আরেক সঙ্গীও কাছেই বসে ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে কফি খাচ্ছে। সে হল আমার বিশিষ্ট বন্ধু ইংরাজ ভূতত্ত্ববিদ্ জেরেমি সণ্ডার্স। সণ্ডার্সের আমন্ত্রণেই এবার আমার লণ্ডনে আসা। হ্যাম্প-স্টেডে ওর বাড়িতে ক্রোল আর আমি অতিথি হয়ে আছি। আরো দিন সাতেক থাকার কথা। এবার ইংলণ্ডে গ্রীষ্ম-কালটা ভারী উপভোগ্য মনে হচ্ছে। বৃষ্টি নেই। নীল আকাশে সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি মানুষের মন ও শরীরকে তাজা করে দিচ্ছে।

এবারে লেখা শেষ করি। ক্রোলের বাঁশি থেমেছে। তার সঙ্গে লণ্ডনের এক নীলাম-ঘরে যেতে হবে। সেখানে নাকি অ্যালকেমি সম্বন্ধে স্প্যানিশ ভাষায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটা পাণ্ডুলিপি বিক্রী আছে। ক্রোলের ধারণা সেটা সে সস্তায় হাত করতে পারবে, কারণ অ্যালকেমি সম্বন্ধে আজকাল আর লোকের তেমন উৎসাহ নেই। আণবিক যুগে কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরি করা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও, আর অসম্ভব নয়।

২৪শে জুন, রাত সাড়ে দশটা

নীলামে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাভারিয়ার অধিবাসী ক্রোল স্বভাবতঃ হাসিখুশি দিলদরিয়া মানুষ, তাকে এভাবে উত্তেজিত হতে বড় একটা দেখিনি। অ্যালকেমি সম্বন্ধে যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটা সে পঞ্চাশ পাউণ্ডের মধ্যে পাবে বলে আশা করেছিল, তার জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে দিতে হল দেড় হাজার পাউণ্ড। অর্থাৎ আমাদের হিসাবে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা। এতটা দাম চড়ার কারণ একটি মাত্র ব্যক্তি, যিনি ক্রোলের সঙ্গে যেন মরিয়া হয়ে পাল্লা দিয়ে সাতশো বছরের পুরোন জীর্ণ কাগজের বাণ্ডিলটাকে জলের দর থেকে দেখতে দেখতে আগুনের দরে চড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের পোষাক ও কথার উচ্চারণ থেকে তাকে আমেরিকান বলে মনে হচ্ছিল। ক্রোলের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে যাওয়াতে তিনি যে আদৌ খুশি হন নি সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। এর পরে যতক্ষণ ছিলেন নীলামে ততক্ষণ তাঁর কপালে ভ্রূকুটি দেখেছি।

ক্রোল অবিশ্যি বাড়ি ফেরার পর থেকেই পাণ্ডুলিপিটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কাগজের অবস্থা জীর্ণ হলেও, হাতের লেখা অত্যন্ত পরিষ্কার, কাজেই পড়তে কোনো অসুবিধা হবে না। আর ক্রোল স্প্যানিশ ভাষাটা বেশ ভালোই জানে। স্পেনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যাল-

কেমি নিয়ে রীতিমত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সেটা আমি জানি। প্রভাবটা এসেছিল আরব দেশ থেকে, আর সেটা ইউরোপের অনেক জায়গাতেই বেশ স্থায়ী ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ধাতুর রাজা হল সোনা। সোনা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, সোনা অক্ষয়। পুরাণে সোনাকে বলা হয় সূর্য, আর রূপোকে চাঁদ। হাজার হাজার বছর ধরে এক শ্রেণীর লোক তামা, সীসা ইত্যাদি সাধারণ ধাতু থেকে কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরি করা যায় কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এসেছে। এদেরই বলা হত অ্যালকেমিস্ট, যার বাংলা হল অপরাসায়নিক। এ কাজে বৈজ্ঞানিক উপায়ের সঙ্গে নানারকম মন্ত্রতন্ত্র মেশানো হত বলেই খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরা অ্যালকেমিস্টদের কোনদিন আমল দেয়নি। আমাদের দেশেও যে অ্যালকেমির চর্চা হয়েছে তার প্রমাণ আছে আমার সংগ্রহের একটা সংস্কৃত পুঁথিতে। এর নাম ধনদাপ্রকরণতন্ত্রসার। এতে সোনা তৈরির অনেক উপায় বাতলানো আছে। তার মধ্যে একটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

'তাম্র সীস কিম্বা পিত্তল জারিত করিয়া ভস্ম করিয়া লইবে। তৎপরে মৃত্তিকাতে চারিহস্ত গভীর একটি গর্ত করিয়া কপিত্থবৃক্ষের অঙ্গার দ্বারা ঐ গর্তের অর্ধ পূর্ণ করিয়া তদুপরে তাম্রভস্ম দিয়া বনঘুইটা দ্বারা গর্ত সমুদায় পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিবে। সপ্তাহ পর্যন্ত জ্বাল দিয়া পরে উহা উঠাইয়া সেই পাত্রে করিয়া বিরজাঙ্গারের অগ্নিতে জ্বাল দিবে। এইরূপ করিলে তামা গলিয়া যাইবে, তৎপর তাহাতে তামার অর্ধ পারদ দিয়া তাহাতে বিরজাকাষ্ঠের রস বাসকের রস ও সিজের রস দিবে। এইরূপ করিলে স্বর্ণ হইয়া থাকে।'—এখানে শেষ হলে তাও না হয় হত, কিন্তু তার পরেই বলা হয়েছে—'এই প্রক্রিয়ার পূর্বে দশ সহস্র ধনদা মন্ত্র জপ ও তৎপূজা এবং হোম করিতে হইবে। তাহা হইলেই কার্য সফল হইবে।'

সাধে কি আর আমি ব্যাপারটা কোনোদিন চেষ্টা করে দেখিনি। অবিশ্যি আমি না করলে কী হবে। ইতিহাসে অ্যালকেমিস্টদের উল্লেখ সর্বকালেই পাওয়া যায়। ইউরোপের অনেক রাজারা মাইনে করে অ্যালকেমিস্ট রাখতেন এবং তাদের জন্য ল্যাবরেটরি তৈরি করে দিতেন এই আশায় যে রাজকোষে সোনা কম পড়লে এরা সে অভাব মিটিয়ে দিতে পারবে। অবিশ্যি কেউ কোনদিন পেরেছে কিনা সে খবর জানিনা। মোট কথা, ক্রোল যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করে সেটা ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। নইলে আর একটা পাণ্ডুলিপির পিছনে এত খরচ করে? সণ্ডার্স বলছে ক্রোলের বিশ্বাস ল্যাবরেটরিতে বসে সোনা তৈরি করে অনায়াসে খরচ পুষিয়ে নেবে। ওর এই উদ্ভট খেয়াল নিয়ে বেশি হাসাহাসি না করলে হয়ত আমরাও সে সোনার ভাগ পেতে পারি!

২৫শে জুন

আমি লণ্ডনে এসে আমার গিরিডির অভ্যাস মতো ভোর পাঁচটায় উঠে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোই। এখানে গ্রীষ্মকালে পাঁচটায় দিব্যি ফুটফুটে আলো, কিন্তু সকালে সাহেবদের ওঠার অভ্যাস নেই বলে রাস্তাঘাট ও আমার বেড়াবার প্রিয় জায়গা হ্যাম্পস্টেড হীথ থাকে জনমানব শূন্য। সমুদ্রের মতো ঢেউ খেলানো এই সবুজ মাঠে একা ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ভোরের আলোবাতাসে শরীরটাকে তাজা করে আমি যখন বাড়ি ফিরি ততক্ষণে সণ্ডার্স উঠে কফি তৈরি করে ফেলে। ক্রোলের উঠতে উঠতে হয় নটা, কারণ তার রাত জেগে পড়া অভ্যাস।

আজ অবাক হলাম দেখে যে ক্রোল এরই মধ্যে উঠে সণ্ডার্সেরও আগে নিজেই কফি বানিয়ে নিয়ে বৈঠকখানায় ব্যস্তভাবে পায়চারি করছে। আমাকে দোরগোড়ায় দেখেই সে টক্ করে হাঁটা থামিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে এক অবাক প্রশ্ন করে বলল—

'তোমার রাশি ত বৃশ্চিক—তাই নয় কি?'

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালাম।

'তোমার চুলের রঙ পাকার আগে কালো ছিল কি?'

আবার 'হ্যাঁ।'

'তোমার রশুন খাওয়া অভ্যেস আছে?'

'তা মাঝে মাঝে খাই বৈ কি।'

'ব্যস্। তাহলে তোমাকে ছাড়া চলবে না। কারণ

সণ্ডার্স সিংহ রাশি আর আমি বৃষ। সণ্ডার্সের চুলের রঙ কটা, আর আমার সোনালি। আর আমরা দুজনের কেউই রসুন খাই না।'

'কী হেঁয়ালি করছ বলত তুমি?'

'হেঁয়ালি নয় শঙ্কু। মানুয়েল সাভেদ্রা তার পাণ্ডুলিপিতে লিখেছে কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরি করতে গেলে ল্যাবরেটরিতে এই তিনটি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি অন্তত একজন থাকা চাই। কাজেই তোমাকে চাই।'

'কোথায় চাই? কাজটা কি এই হ্যাম্পস্টেডে বসেই হচ্ছে নাকি? সণ্ডার্স-এর এই বৈঠকখানা হবে অ্যালকেমিস্টের গবেষণাগার?' ক্রোলকে সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত কিনা সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না।

ক্রোল গম্ভীর ভাবে দেয়ালে টাঙানো একটা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ফোর ডিগ্রী ওয়েস্ট বাই থার্টি সেভেন পয়েন্ট টু ডিগ্রী নর্থ।'

আমি ম্যাপের দিকে না দেখেই বললাম, 'সে তো স্পেন বলে মনে হচ্ছে। গ্রানাডা অঞ্চল না?'

'ঠিকই বলেছ,' বলল ক্রোল, 'তবে আসল জায়গাটার নাম ম্যাপ না দেখলে জানতে পারবে না।'

আমি ম্যাপের দিকে এগিয়ে গেলাম। হিসেব করে যেখানে আঙুল গেল সেখানে একটি মাত্র নাম পেলাম—মণ্টেফ্রিও। ক্রোল বলল এই মণ্টেফ্রিওই ছিল নাহি পাণ্ডুলিপির লেখক মানুয়েল সাভেদ্রার বাসস্থান।

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'—আমি না বলে পারলাম না। 'সাতশো বছরের পুরোনো বাড়ি এখনো সেখানে রয়েছে একথা কে বলল তোমায়? আর তাছাড়া পাণ্ডুলিপিতে যদি সোনা তৈরির উপায় লেখাই থাকে তাহলে সে তো যে কোন ল্যাবরেটরিতেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। তার জন্য স্পেনে যাবার দরকার হচ্ছে কেন?'

ক্রোল যেন আমার কথায় বেশ বিরক্ত হল। হাতের কফি কাপটা সশব্দে টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল, 'তুমি যে-ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলছ এটা সেরকম নয় শঙ্কু। তাই যদি হত তাহলে তুমি রসুন খাও কিনা আর তোমার চুলের রঙ কালো ছিল কিনা এসব জিগ্যেস করার কোনো দরকার হত না। এখানে বিজ্ঞানের সঙ্গে দিনক্ষণ লগ্ন, গবেষণাগারের ভৌগোলিক অবস্থান, পরীক্ষকের মন-মেজাজ-স্বাস্থ্য-চেহারা সব কিছুরই সমন্বয় ঘটছে। এ জিনিস ফেলনা নয়; একে ঠাট্টা কোর না। আর সাতশো বছরের পুরোন বাড়ি থাকবে না কেন? ইউরোপে মধ্যযুগের কেল্লা দেখনি? তারা ত এখনো দিব্যি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সাভেদ্রা ছিল ধনী বংশের ছেলে। তার বাড়ির যা বর্ণনা পাচ্ছি তাতে সেটাকে একটা ছোটখাটো কেল্লা বলেই মনে হয়। হলই না হয় একটু জীর্ণ অবস্থা; তার মধ্যে একটা ঘর কি পাওয়া যাবে না যেটাকে আমরা ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি? অবিশ্যি সে বাড়িতে যদি এখনো লোক থেকে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে হয়ত একটা বোঝাপড়া করতে হতে পারে। কিন্তু পয়সা দিলে কাজ হবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না। অ্যালকেমি তো—?'

'এই সাতসকালে কী নিয়ে এত বচসা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে?'

সণ্ডার্সকে ঘরে ঢুকতে আমরা কেউই দেখিনি। ক্রোল সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে সণ্ডার্সকে পুরো ব্যাপারটা বলল। সব শেষে বলল, 'একটা কাল্পনিক জানোয়ারের সন্ধানে আমরা তিব্বত যেতে পারি, আর যেখানে সোনা তৈরি করার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে মাত্র দুঘণ্টার প্লেন জার্নি করে ঘরের কোনায় স্পেনে যেতে এত আপত্তি?'

সণ্ডার্স দেখলাম তর্কের মধ্যে গেল না। কারণ বোধ হয় এই যে ক্রোলের হাবভাবে একটা সাংঘাতিক গোঁ আর একটা চরম উত্তেজনার ভাব ফুটে বেরোচ্ছিল। সণ্ডার্স বলল; 'স্পেনে যেতে আমার আপত্তি নেই, হয়ত শঙ্কুরও নেই, কিন্তু তোমার এই গবেষণায় এক শঙ্কু ছাড়া আর কী কী উপাদান লাগবে সেটা জানতে পারি কী?'

'উপাদানের চেয়েও যেটা বেশি জরুরী,' বলল ক্রোল, 'সেটা হল সময়টা। সাভেদ্রা মিডসামারের সাতদিন আগে বা পরে যে কোনোদিন ঠিক দুপুর বারোটার সময়

কাজ আরম্ভ করতে বলেছে—কারণ সারা বছরের মধ্যে ওই কটা দিন সূর্যের তেজ থাকে সবচেয়ে বেশি। মালমশলা অত্যন্ত সহজলভ্য। পারা আর সীসার কথা ত সব দেশের অ্যালকেমিতেই পাওয়া যায়; এখানেও সেদুটো আছে। এ ছাড়া লাগবে জল, গন্ধক, নুন, কিছু বিশেষ গাছের ডাল, পাতা ও শিকড়। যন্ত্রপাতির মধ্যে মাটি আর কাঁচের জিনিস ছাড়া আর কিছু চলবে না—এটাও অন্য অ্যালকেমির বইয়েতেও লেখে—আর এছাড়া চাই একটা হাপর, চুল্লি, মেঝেতে একটা চৌবাচ্চা—'

'কেন, চৌবাচ্চা কেন?' প্রশ্ন করল সণ্ডার্স।

'বৃষ্টির জল ধরে জমিয়ে রাখতে হবে তাতে। এটা অন্য কোনো অ্যালকেমির বইয়েতে পাইনি।'

'পরশপাথরের কথা বলেছে কি?' আমি প্রশ্ন করলাম। পরশপাথরের সংস্কার সব দেশেই আছে। আমি যেসব অ্যালকেমির বিবরণ পড়েছি, তাতে পরশপাথর তৈরিই হল গবেষণার প্রথম কাজ। তারপর সেই পাথর ছুঁইয়ে অন্য ধাতুকে সোনায় পরিণত করা হয়।

ক্রোল বলল, 'না। সাভেদ্রা পরশপাথরের কোনো উল্লেখ করেনি। উপাদানগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে একটা চিটচিটে পদার্থে পরিণত হবে। সেটাকে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশিয়ে পিউরিফাই করার একটা পর্ব আছে। তার ফলে যে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয় সেটাই ক্যাটালিস্টের কাজ করে। অর্থাৎ এই তরল পদার্থের সংস্পর্শে এসেই সাধারণ ধাতু সোনা হয়ে যায়।'

'সাভেদ্রার ক্ষেত্রে পরীক্ষা সফল হয়েছিল কি?' সণ্ডার্স একটু বাঁকা ভাবে প্রশ্নটা করল।

ক্রোল একটুক্ষণ চুপ থেকে পাইপে তামাক ভরে বলল, 'পাণ্ডুলিপিটা আসলে একটা ডায়রি। অন্যের উপকারের জন্য টেক্সট্‌ বই হিসেবে লেখা নয় এটা। পরীক্ষা যত সফলতার দিকে গেছে, সাভেদ্রার ভাষা ততই কাব্যময় হয়ে উঠেছে। 'আজ অমুক সময় আমি সোনা তৈরি করলাম'—এ ধরনের কথা কোথাও লেখা নেই ঠিকই, কিন্তু সাভেদ্রা শেষের দিকে বলেছে'—ক্রোল পিয়ানোর ওপরে রাখা পাণ্ডুলিপিটা তুলে নিয়ে তার শেষ পাতাটা খুলে পড়ল—"আজ নিজেকে শুধু বিজ্ঞানী বা যাদুকর বলে মনে হচ্ছে না; আজ মনে হচ্ছে আমি শিল্পীর সেরা শিল্পী—যার মধ্যে এক ঐশ্বরিক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে, যার হাতের মুঠোয় এসে গেছে সৃষ্ট বস্তুকে অবিনশ্বর রূপ দেবার অমোঘ ক্ষমতা...।" এ থেকে কী বুঝতে চাও তোমরাই বুঝে নাও।'

আমি আর সণ্ডার্স পরস্পরের দিকে চাইলাম। কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ; বুঝতে পারছি আমার মতো সণ্ডার্সের মনেও হয়ত ক্রোলের উৎসাহের কিছুটা ছোঁয়াচ লেগেছে। সণ্ডার্স যেন উৎসাহটাকে জোর করে চাপা দিয়ে পরের প্রশ্নটা করল।

'অনুষ্ঠান বা মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না এতে?'

ক্রোল পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'প্রেতাত্মা নামানোর ব্যাপার একটা আছে—যেদিন কাজ শুরু করা হবে তার আগের দিন রাত্রে।'

'কার প্রেতাত্মা?'

'জগদ্বিখ্যাত আরবদেশীয় অ্যালকেমিস্ট জবীর ইব্‌ন হায়ানের। দশম শতাব্দীর এই মহান্‌ ব্যক্তিটির নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আর কিছুই না—তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে নেওয়া আর কি। তবে সে কাজটা আমি থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না।'

ক্রোল মিউনিকে একটা প্ল্যানচেট সমিতির সভাপতি সেটা আমি জানতাম।

'আর দরকার লাগবে ওকে।'

কথাটা বলল ক্রোল—আর তার দৃষ্টি ঘরের দরজার চৌকাঠের দিকে। চেয়ে দেখি সেখানে সণ্ডার্সের পারস্য দেশীয় মার্জার মুস্তাফা দণ্ডায়মান।

'ওকে মানে?' চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল সণ্ডার্স। সণ্ডার্স বেড়াল-পাগল—কতকটা আমারই মতো। তিন বছর আগে আমার গিরিডির বাড়িতে এসে সে আমার বেড়াল নিউটনের গলায় একটা লাল সিল্কের রিবন বেঁধে দিয়ে গিয়েছিল।

ক্রোল বলল, 'বেড়াল সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছে

সাভেদ্রা। গবেষণাগারে বেড়ালের উপস্থিতি অব্যর্থভাবে কাজে সাহায্য করে। তার অভাবে প্যাঁচা। কিন্তু আমার মনে হয় বেড়াল যখন হাতের কাছে রয়েইছে তখন প্যাঁচার চেয়ে…'

সণ্ডার্স বা আমি কেউই সরাসরি ক্রোলকে স্পেন যাওয়া নিয়ে কথা দিলাম না—যদিও ক্রোল বারবার বলে দিল কর্কটক্রান্তির সুযোগটা না নিলে আবার এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা তিন জনে হ্যাম্পস্টেড হীথে মেলা দেখতে গেলাম। এটা প্রতিবছর একবার করে হয় এই গ্রীষ্মের সময়। দোকানপাট জুয়োর জায়গা নাগর-দোলা মেরি-গো-রাউণ্ড আর ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ির ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে পৌঁছলাম সেখানে একটা সুসজ্জিত ক্যারাভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে লেখা—'কাম অ্যাণ্ড হ্যাভ ইউর ফরচুন টোল্ড বাই ম্যাডাম রেনাটা'।

মহিলা নিজেই পর্দা দেওয়া জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছেন, আমাদের দেখে সহাস্যে গুড মর্ণিং করলেন। এ জাতীয় বেদে শ্রেণীর মহিলা ফরচুন-টেলারদের এদেশে প্রায়ই দেখা যায়—বিশেষ করে মেলায়। ক্রোল ত তৎক্ষণাৎ স্থির করে বসল যে আমাদের ভাগ্য গণনা করিয়ে নিতে হবে। তার পাল্লায় পড়ে আমরা তিনজনেই ক্যারাভ্যানে গিয়ে উঠলাম।

বিশালবপু ম্যাডাম রেনাটা ঘর সাজিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে আছেন খদ্দেরের অপেক্ষায়। সরঞ্জাম সামান্যই। একটা গোলটেবিলের উপর কাঁচের ফুলদানিতে একটি মাত্র লাল গোলাপ, আর তার পাশে একটা কাঁচের বল—যাকে এঁরা ক্রিস্ট্যাল বলে থাকেন। এই ক্রিস্ট্যালের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে এঁরা নাকি খদ্দেদের ভবিষ্যতের ঘটনা চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পান।

ক্রোল আর ভনিতা না করে বলল, 'বলুন ত ম্যাডাম, আমাদের তিন বন্ধুর জীবনে সামনে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে চলেছে কিনা। আমরা তিনজনে একসঙ্গে

একটা বড় কাজে হাত দিতে যাচ্ছি।'

রেনাটা কনুই দুটোকে টেবিলের ওপর ভর করে ক্রিস্ট্যালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। আমরা তিনজনে তার সামনে টেবিলটাকে ঘিরে তিনটে চেয়ারে বসেছি। বাইরে থেকে নাগরদোলার বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর তার সঙ্গে বাচ্চাদের কোলাহল। ক্রোলও দেখি মাথাটা এগিয়ে দিয়েছে বলটার দিকে।

'আই সী দ্য সান রাইজিং'—প্রায় পুরুষালি কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে বললেন ম্যাডাম রেনাটা। ক্রোলের নিশ্বাস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সান বলতে সে সোনাই ধরে নিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'আই সী দ্য সান রাইজিং ফর ইউ,' আবার বললেন ম্যাডাম রেনাটা। 'অ্যাণ্ড—'

মহিলা চুপ। এবার আমারও যেন বুকটা দুর দুর করছে। এসব ব্যাপারে বয়স্ক লোকদেরও যেন আপনা থেকেই ছেলেমানুষ হয়ে যেতে হয়।

'অ্যাণ্ড হোয়াট?' অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল ক্রোল। তার আর তর সইছে না। কিন্তু ম্যাডাম রেনাটা নির্বিকার। তাঁর হাত দুটো বলটাকে দুপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে—বোধ হয় বাইরের আলো বাঁচিয়ে ভবিষ্যতের ছবিটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য।

'অ্যাণ্ড—' আবার সেই খস্‌খসে পুরুষালি কণ্ঠস্বর—'অ্যাণ্ড আই সী ডেথ। ইয়েস, ডেথ।'

'হুজ ডেথ?' ক্রোলের গলা এই দুটো কথা বলতেই কেঁপে গেল। আবার দ্রুত পড়ছে তার নিশ্বাস।

'দ্য ডেথ অফ এ রেডিয়্যাণ্ট ম্যান।'

অর্থাৎ একজন দীপ্যমান পুরুষের মৃত্যু।

এর বেশি আর কিছু খুলে বললেন না ম্যাডাম রেনাটা। দীপ্যমান পুরুষটি কেমন দেখতে জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'হিজ ফেস ইজ এ ব্লার।' অর্থাৎ তার মুখ ঝাপসা।

সণ্ডার্স চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ভদ্রমহিলার ঘোর কেটে গেছে। তিনি হাসিমুখে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছেন। সণ্ডার্স সেই হাতে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে দিল। আমরা তিনজনে ক্যারাভ্যান থেকে বেরিয়ে এলাম।

[ক্রমশঃ]

খুদে দুর্জয়

প্রণব মুখোপাধ্যায়

রাম বাহাদুর বিক্রম সিং জবরদস্ত
ঘোঁঘট রাজার সেনাবাহিনীর যোদ্ধা মস্ত।
রাজার পীরিতে দিন কেটে যায় মোটা তনখায়
ঘরে তবু তার ছেলে বউ কাঁপে মহাশঙ্কায়।
রাত পোহালেই তরবারি তার ঘোরে দুর্বার
চোখের সমুখে যাই পায় তাই হয় চুরমার।
চুমরিয়ে গোঁফ, ঈষৎ উষ্ণ করে নিয়ে গাটা
একখানি কোপে পোষা মার্জার হল কচু কাটা।
বেলা যত বাড়ে দরদর ঝরে শরীরে ঘর্ম,
রেখে তরবারি নিঃশ্বাস ছাড়ি আঁটেন বর্ম—

চিবিয়ে পেস্তা গমন করেন যুদ্ধক্ষেত্রে,
ভয়ে আধমরা ছেলে বউ চায় অবাক নেত্রে।
তরবারি নাড়ি লাভ করেছেন খেতাব মস্ত
হুঙ্কার ছাড়ি মহড়া চালান উদয় অস্ত।
লক্ষ সমরে জয়ী তবু রাজা ক্লান্ত নন্ তো
যোদ্ধা হাজির, লড়াইবাজীর নেইকো অন্ত,
রণের দামামা পিটিয়ে দেদার দিবস রাত্র
ঘোঁঘট রাজের মহাবাদকের টাটায় গাত্র।
রামের পুত্র নামটি তাহার চন্দ্রবদন,
গোলাকার বপু, বাপমার অতি আদরের ধন।
বাপের কৃপায় ভালো ও মন্দ খাদ্যটা জোটে
বছরে বাড়লো, উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট মোটে।
রাম বাহাদুর করে নিবেদন নানান ছলেতে
'মোর পুত্রকে নিন মহারাজ সৈন্যদলেতে।
পরম-শৌর্য-পদক-ভূষিত আমি ওর পিতা
পরখ করুন কতদূর ওর পারদর্শিতা।'
রাজা হেসে কন, 'ভাগ্য তোমার ছেলেটি বাঁচলে
দুধে ভাতে থাক ঘরের কোনায় মায়ের আঁচলে।
পাগড়িতে ঢাকে চাঁদবদনের মাথা ও বক্ষ
এমন কাণ্ড দেখলে হাসবে শত্রুপক্ষ।
পুরোপুরি বড় হল নাকো ও যে মনুষ্য আধা!'
বাহাদুর ভাবে হায় গেল মোর মানমর্যাদা।
যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাম বাহাদুর অটল ভূধর,
পুত্র শুধুই রান্নাঘরেতে ভরায় উদর।

হতাশ মনেতে মার সাথে ধরে হাতা ও খোন্তা,
পোলাও কালিয়া রুটি লুচি পুরী ভাজা ও নোনতা
সর্বপ্রকার রন্ধন কাজে পাকালো সে হাত,
নব আহার্য প্রথাপ্রকরণ ভাবে দিন রাত।
একবার হল ঘোঁঘটের দেশে যুদ্ধটা ভারি,
সেনাবাহিনীর পাচকেরা ফেলে রান্নার হাঁড়ি
ছুটল যুদ্ধে যদি মওকায় পদকটা জোটে
জীবনেও আর হাতাখুন্তিটা ধরবে না মোটে।
সৈন্য ঘাটতি, সেনাপতি এনে পাচকের দলে
সম্মুখ রণে ভিড়িয়ে দিলেন অতি কৌশলে।
পদক খেতাব জুটল না কিছু মন্দ বরাত
প্রাণটি হারিয়ে যুদ্ধ ভূমিতে সবে কুপোকাৎ।
নতুন পাচক হইল যাহারা তালিকাভুক্ত
হাতটি খুলিয়া নানা ব্যঞ্জনে করিল যুক্ত
হরেক মশলা, তাই খেয়ে সব সৈন্য নিত্য
যুদ্ধক্ষেত্রে করে আই ঢাই, বাড়ল পিত্ত।
সৈন্যদলের হইল সেবার মহাপরাজয়
পাচকের দল শত্রুর চর হবে নিশ্চয়
এই ভেবে তারা ধেয়ে এল হাতে খোলা তরবারি,
হাঁকল, মুণ্ডু ঝোলাবো তোদের বজ্জাত ধাড়ী
কচু কাটা করে ছাড়ব তোদের সম্মুখে পেলে
পাচকের দল দিল চম্পট হাঁড়ি কড়া ফেলে।
রাজার শিবিরে ঘনালো সে এক সঙ্কট বড়,
সৈন্যরা হায় কেউ কভু নয় রন্ধনে দড়।

পাচক অভাবে দিনে দিনে সবে হল হীন তাই,
দিবস রাত্রি ঘোঁঘট রাজার এক চিন্তাই।
হেন সংকটে রাজার সমুখে হইয়া উদয়
রামের পুত্র আধা মনুষ্য গলা ছেড়ে কয়,
'সৈন্যের দলে নাম লিখবার হয়নি বরাত,
অনুমতি দিন যোদ্ধাগণেরে রেঁধে দিই ভাত
নিত্যি নতুন চোব্যচোষ্য নানাব্যঞ্জনে,
দশটি বছর কাটলো রান্না ঘরটির কোনে।'
তাই শুনে রাজা তখুনি একটি কথাতেই রাজি,
বললেন, 'চাঁদ দেরি নয় তুমি লেগে পড়ো আজই।'
বহুদিন হল খায় নি সৈন্য উদরটি ভরি
কি করে লড়বে হাড় মাস যদি হয় কমজোরি ?'
ব্যাপার দেখে ত রামের মাথায় গর্জায় বাজ
হায়রে বিধাতা, ছেলের ভাগ্যে হেন নীচু কাজ !
রাজার শিবিরে পুনরায় চাপে রান্নার হাঁড়ি,
চন্দ্রবদন জনা তিরিশেক নিয়ে সহকারী
যুদ্ধক্ষেত্রে নিত্যি লাগায় মহা ভূরি ভোজ
ভর পেটে তাই সৈন্য যুদ্ধে জিতে আসে রোজ।
রাজা দিলখোস, চুমরিয়ে গোঁফ হাঁকলেন, তোফা
রামের পুত্রে ডেকে আন ওর মিলবে শিরোপা।
রাম তবু হায় বুঝি মরে যায় সর্বদা লাজে
যোদ্ধার ছেলে পরিচয় পাবে পাচকের কাজে !

চাঁদ বদনের ইচ্ছা রাঁধবে আজব খাদ্য,
খাওয়াবে রাজাকে থামলে ক্ষণেক রণের বাদ্য।
একদিন প্রাতে হয়েছে সকল শত্রু নিপাত,
রামের পুত্র রাজার চরণে করে প্রণিপাত।
সম্ভ্রমে অতি নত মস্তকে হাত করে জোড়
বলে, 'মহারাজে তুষ্ট করব ইচ্ছাটি মোর।
আদেশ করুন আপনার তরে নব আহার্য
প্রস্তুত করি, দেখে দিনক্ষণ করুন ধার্য।'
রাজা কইলেন, 'সয়নাকো দেরি, আজকে রাত্রে
নতুন রান্না পড়া চাই মোর আহার পাত্রে।'
চন্দ্রবদন তড়িঘড়ি স্বরু করল কার্য
আস্ত মোরগে দিয়ে হবে এক নব আহার্য।
ঘৃত সহযোগে ফলমূল আর দারুচিনি জিরে
পুরে দেওয়া হল আস্ত প্রাণীর উদরটি চিরে।
তারপর সেটা রন্ধন হবে কি মত প্রকারে
তাহা আর কভু শেখাতে হবে না রামের খোকারে।
গন্ধ যেমনি ছুটেছে হাওয়ায় রাজার কক্ষে
সম্ভব নয় বসে থাকা মিছে তাঁহার পক্ষে।
নিয়ে তরবারি জলদি চলেন ভোজনের ঘর,
সঙ্গে ছুটল শরীর রক্ষী ছয় অনুচর।
আধা মনুষ্য রামের পুত্র নিয়ে এল বয়ে
বিশাল মোরগ গরমাগরম মহাসমারোহে।
দেখে শুনে সব অনুচরদের জিভে জল ঝরে
ঘোঁঘট রাজার করুণা হইল তাহাদের পরে

হাঁকেন, মাংস ভাগ করা হবে সাতখানি ভাগে,
কে আছ জলদি বড় ছুরি খানি নিয়ে এস আগে।
ছুরিটির তরে লোকেরা লাগায় মহা খোঁজাখুঁজি,
চন্দ্রবদন পড়ল ফাঁপরে অবস্থা বুঝি।
মহা আশঙ্কা, মনে মনে সে তো গনিল প্রমাদ
আর দেরি হলে উবে যাবে তার রান্নার স্বাদ!
রাজাকে তুষ্ট করতে সকল মেহনত তারই
মাঠে মারা যাবে? তুলে নিল তাই রাজ তরবারি,
নিখুঁত হস্তে অসি চালনায় আস্ত কুঁকড়ো
মুহূর্তে হল সমান ভাগেতে সাতটি টুকরো!

তাই দেখে রাজা হতবাক, হ'ল চোখ ছানাবড়া
হাঁকেন, 'পরম বীরের পদক নিয়ে এস ত্বরা।
হেন যোদ্ধাটি দেখিনিত যার অসি কথা কয়
আজ থেকে এর নাম রাখলাম খুদে দুর্জয়!'
সেই দিন হতে রইল না আর কোনরূপ বাধা,
রাম বাহাদুর ফিরে পেল তার মান মর্যাদা।
দেখল সবাই ঘোঁঘট রাজের সৈন্যের পিছে
তরবারি টেনে চলে দুর্জয় পাগড়ির নিচে।
যুদ্ধে চলে সে সজ্জিত বেশে অসি আর ঢালে
পাকশালে আর দেখেনিকো তারে কেউ কোনকালে।

গোয়েন্দা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেনচারের দুটি নতুন কাহিনী

সত্যজিৎ রায়ের

ফেলুদা এণ্ড কোং

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম—৮.০০

ফেলুদার দুটি নতুন রহস্য অ্যাডভেনচারের কাহিনী সংগ্রথিত হয়েছে 'ফেলুদা এণ্ড কোং'-এ : 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' আর 'গোসাঁইপুর সরগরম'।

স্বনামধন্য রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলির বত্রিশ নম্বর উপন্যাস 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' নিয়ে হিন্দী ছবি তৈরী হচ্ছিল। তারই শুটিং দেখতে বোম্বাই গিয়েছিল ফেলুদা, তোপ্‌সে আর জটায়ু। আর, তাইতেই পাকাল জট। সে জট শেষ পর্যন্ত গড়াল খুন অবধি।

'গোসাঁইপুর সরগরম'-এর রহস্য অবশ্য খুন নয়—খুনের আশঙ্কা নিয়ে। এখানেও সেই অবিচ্ছেদ্য ত্রয়ী—ফেলুদা, তোপ্‌সে আর জটায়ু।

দুটি অ্যাডভেনচারেই, বলা বাহুল্য, ফেলুদা বিজয়ী। তার এই জোড়া-জয় তার জোড়া-অনুচর তোপ্‌সে-জটায়ুর মতো নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করবে তার অজস্র অনুরাগী পাঠককে।

ফেলুদার আর সব বইয়ের মতোই 'ফেলুদা এণ্ড কোং'ও যথারীতি আগাগোড়া ঝকঝকে লাইনো টাইপে ছাপা; আর, তার সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচুর ইলাসট্রেশন এবং দারুণ প্রচ্ছদ।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বই

বাদশাহী আংটি	৫.০০	এক ডজন গপ্‌পো	১০.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা	৫.০০	গ্যাংটকে গণ্ডগোল	৫.০০
সোনার কেল্লা	৬.০০	বাক্স-রহস্য	৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি	৫.০০	সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু	৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য	৫.০০	আরো এক ডজন	১০.০০
জয় বাবা ফেলুনাথ	৬.০০	ফটিকচাঁদ	৮.০০

সুকুমার রায়ের রচনাবলী

সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম খণ্ড)	২৫.০০	সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য় খণ্ড)	৩০.০০
সমগ্র শিশুসাহিত্য	১০.০০	জীবজন্তু	৮.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ● ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

সন্দেশ-এর নিয়মাবলী

(১) সন্দেশের বার্ষিক সডাক মূল্য ১৮·০০, বৈশাখ-আশ্বিন (ছয়মাস) ১১·০০ এবং কার্তিক-চৈত্র ৭·০০। পূজা সংখ্যা রেজি: ডাকে যাবে।

(২) শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিলে যথাক্রমে ১৬·০০, ৯·০০ ও ৭·০০, সব কটি সংখ্যা হাতে নিলে ১৫·০০, ৮·৫০ এবং ৬·৫০।

(৩) প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ১·৫০, শারদীয়া সংখ্যা (আনুমানিক) ৬·৬০।

(৪) যে কোন সময়ে চাঁদা দিয়ে বৈশাখ (এপ্রিল) অথবা কার্তিক (অক্টোবর) থেকে ছয়মাস বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হওয়া যায়।

(৫) প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি বা ইংরাজি মাসের শেষে সন্দেশ প্রকাশিত হবে।

(৬) পরবর্তী ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও সন্দেশ না পেলে এবং লিখিতভাবে জানালে, ডুপ্লিকেট কপি পাঠানো হবে। জেলা স্কুলবোর্ডের স্কুলগুলি লিখবেন পরবর্তী ইংরেজি মাসের শেষে।

(৭) যথাসময়ে অপ্রাপ্তিসংবাদ না জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। তবে, অবশিষ্ট থাকলে, এবং ডাক খরচ ২৫ পয়সা পাঠালে, অথবা নিজে এসে নিয়ে গেলে, দেওয়া হবে।

(৮) সন্দেশের চাঁদা মনিঅর্ডার, নগদ অথবা চেকে পাঠান যায়।

(৯) চেকে টাকা পাঠালে, Sandesh নামে চেক লিখবেন।

(১০) মফঃস্বল ব্যাঙ্কের উপর চেক দিলে ভাঙাবার খরচ অতিরিক্ত ৫ টাকা লাগবে।

(১১) সন্দেশের জন্য সমস্ত রচনা ও চিঠিপত্র সম্পাদকের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

(১২) গ্রাহক-গ্রাহিকারা রচনা ধাঁধা প্রতিযোগিতার উত্তর ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে গ্রাহকের নামের বাঁপাশে গ্রাহক-সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। নিজের নাম ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ড পাঠালে কার্যালয় থেকেও জানান হয়। যে কোন প্রশ্নের উত্তর তাড়াতাড়ি চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড লিখতে হবে। গ্রাহক, স্কুল, ক্লাবের প্রতি ছাত্রই গ্রাহক।

(১৩) স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরিরা চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের সময়ে নিজ নিজ গ্রাহক সংখ্যা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। যাঁরা সার্কল মারফত সন্দেশ পান,সার্কলের এবং জেলার নাম দেবেন। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড ব্যবহার করবেন। গ্রাহক স্কুল ক্লাব লাইব্রেরির ছাত্র/সভ্যরা সব বিভাগে যোগ দিতে পারে।

(১৪) লেখকেরা ফলাফল জানবার জন্য লেখার সঙ্গে স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দেবেন, লেখা ফেরত চাইলে উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম দেবেন (আলগা টিকিট দেবেন না)। পরে কোন সময়ে লেখা সম্বন্ধে জানতে চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড লিখবেন। লেখাটি কোন মাসে দেওয়া হয়েছিল সঠিক না জানালে ফলাফল বলা সম্ভব নয়।

(১৫) পাঁচ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। শতকরা দশ কপি পর্যন্ত ফেরত নেওয়া হবে। আমরা নিজ খরচে এজেন্টের নিকট পত্রিকা পাঠাব, কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে।

(১৬) বাংলা মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক বিজ্ঞাপনদাতারা সন্দেশ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯
(ত্রিকোণ পার্কের দক্ষিণে)
ফোন—৪৬-৪১১১

'নিউস্ক্রিপ্ট'
এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলিকাতা-১২

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫, ডি. এল্. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২/৩, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।